“মার্কসের শ্রেণী সংগ্রামের ধারণা ও পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের কৃষি নীতিঃ পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ”

Dissertation submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master of Philosophy (Arts) in International Relations, Jadavpur University.

Submitted by

SK RASHIDUL HASSAN

Examination Roll No: **MPIN194001**

Registration No: **142399 of 2017-2018**

Under the guidance of

Prof. SHIBASHIS CHATTERJEE

DEPARTMENT OF INTERNATIONAL RELATIONS

JADAVPUR UNIVERSITY

DEPARTMENT OF INTERNATIONAL RELATIONS

JADAVPUR UNIVERSITY

Kolkata-700032

India

2019

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা - ৭০০০৩২, ভারত

JADAVPUR UNIVERSITY
KOLKATA-700 032, INDIA

DEPARTMENT OF INTERNATIONAL RELATIONS

Certified that the thesis entitled মার্কসের শ্রেণী সংগ্রামের ধারণা ও পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের কৃষি নীতিঃ পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ, submitted by me towards the partial fulfillment of the degree of Master of Philosophy (Arts in International Relations of Jadavpur University, is based upon my own original work and there is no plagiarism. This is also to certify that the work has not been submitted by me for the award of any other degree/diploma of the same Institution where the work is carried out, or to any other Institution. A paper out of this dissertation has also been presented by me at a seminar/conference at Jadavpur University thereby fulfilling the criteria for submission as per the M.Phil Regulation (2017) of Jadavpur University.

SK Rashidul Hassan.
NAME- **SK RASHIDUL HASSAN**

Class Roll No.- 001700703001
Examination Roll No.: MPIN194001
Registration No. **142399** of **2017-2018**

One the basis of academic merit and satisfying all the criteria as declared above, the dissertation work of SK RASHIDUL HASSAN. Entitled মার্কসের শ্রেণী সংগ্রামের ধারণা ও পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের কৃষি নীতিঃ পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ is now ready for submission towards the partial fulfillment of the Degree of Master of Philosophy (Arts in International Relations of Jadavpur University.

Head
Department of International Relations
Dept. of International Relations
Jadavpur University

Supervisor & Convener of RAC
PROFESSOR
Department of International Relations
Jadavpur University
Kolkata - 700 032

Member of RAC
Professor
DEPARTMENT OF COMPARATIVE LITERATURE
JADAVPUR UNIVERSITY
KOLKATA-700 032

ফোন ঃ ২৪১৪-৬৩৪৪
ফ্যাক্স ঃ ২৪১৪-৬৩৪৪
Website : http://webmail.jdvu.ac.in
Telephone : 2414-6344
Fax : 2414-6344

Scanned by CamScanner

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

"মার্কসের শ্রেণী সংগ্রামের ধারণা ও পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের কৃষি নীতি পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ" নামক গবেষণা পত্রটি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার এম.ফিলের অভিসন্দর্ভ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক শ্রী শিবাশীষ চ্যাটার্জি মহাশয় আমার গবেষণার নির্দেশক। তিনি গবেষণা কর্ম শুরু থেকে গবেষণায় এই বিস্তৃত এবং সমস্যাকীর্ণ পথের অভিযানের প্রতিমুহূর্তে সূচাধারে ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি প্রয়োজনীয় নির্দেশনামা এবং বহু মূল্যবান গ্রন্থের অনুসন্ধান দিয়েছেন ও মূল লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে প্রেরণা যুগিয়েছেন। আমি শুধু এই গবেষণার কাজের জন্য নয় বরং সারা জীবনের জন্য আমার শিক্ষক, পথপ্রদর্শক ও তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক শ্রী শিবাশীষ চ্যাটার্জি মহাশয়ের কাছে সারা জীবন ঋণী থাকবো। তিনি অতি আন্তরিকতার সাথে আমার গবেষণার অভিসন্দর্ভটির সাথে তাত্ত্বিক ও বাস্তবিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়ে বুঝিয়েছেন ও আমার ভুল ত্রুটি ধরিয়ে দিয়ে সুনির্দিষ্ট পথে চালিত করেছেন ।

আমি আন্তরিক ভাবে ধন্যবাদ জানায় ইতিহাস বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রী কুণাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে। যিনি আমার গবেষণার অভিসন্দর্ভকে গভীরতা প্রদানে সাহায্য করেছে এবং অভিসন্দর্ভকে প্রাসঙ্গিক ভাবে বিশ্লেষণে সাহায্য করছেন, যার জন্য আমি উনার কাছে চির কৃতজ্ঞ থাকিব।

আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের বিভাগীয় প্রধান শ্রী ওম প্রকাশ মিশ্র মহাশয় ও সকল অধ্যাপক অধ্যাপিকা বৃন্দের কাছে। যিনারা সকলে অতি কর্মব্যস্ততায় থাকার সত্বেও আমাকে এই কাজে উৎসাহিত ও প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করেছেন। আমি অশেষ ভাবে কৃতজ্ঞতা জানায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি বিভাগকে। যেখান থেকে আমি প্রতি মাসে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সহায়তা পেয়েছি এই গবেষণামূলক কাজের জন্য।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগীয় গ্রন্থাগার ও কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, আহামেদ পাঠাগার থেকে অসংখ্য সাহায্য ও প্রয়োজন মতো বই পেয়েছি। এছাড়া বিশেষ করে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের গ্রন্থাগার শ্রী পার্থ দা, নন্দিনি ম্যামকে যিনারা আন্তরিকতার সাথে আমাকে আমার এই অভিসন্দর্ভের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহে সাহায্য করেছেন।

আমি আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি বহরমপুর গার্লস কলেজের অধ্যাপক শ্রী খাইবার আলী মিয়াঁ মহাশয়ের কাছে। যিনি নিজের সংগ্রহশালা থেকে বহু পুরনো মূল্যবান নথিপত্র দিয়ে আমার কাজে সাহায্য

করেছেন। এর সাথে সাথেই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি আমার বাল্যকালের শিক্ষক সুজিত ঘোষ মহাশয়কে। যিনি আমাকে উচ্চশিক্ষার প্রেরণা যুগিয়েছেন।

আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আমার স্বহৃদয় দাদা নুর আমিন হক, অজয় বর, নিতাই সাহা, দেবাশিস সরকার, এদের কাছ থেকে পেয়েছি অকৃত্রিম ভালবাসা ও ছোট ভাইয়ের মতো স্নেহ, এর সাথে সাথে ধন্যবাদ জানাই হোস্টেলের ছোটভাই গোকুল ও রতনকে, যাদের কাছ থেকে আমি গবেষণাপত্রটি লেখার সময় উৎসাহ পেয়েছি, যার কাছে আমি চির কৃতজ্ঞ থাকিব তিনি হলেন বিমান সাহা যিনি আমাকে গবেষণা করার পথের দিকে অগ্রসর হওয়ার সাহসিকতা ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিলেন।

আমি আজীবন ঋণী আমার শ্রদ্ধেয় বাবা মোহাম্মদ আজহার সেখ এর কাছে। যিনি এখনো সর্বতোভাবে আমাকে সাহায্য করে চলেছেন। আজ আমি যে উচ্চশিক্ষালাভের ডিগ্রী অর্জন করব তার পুরো কৃতিত্বই তিনার প্রাপ্য। আমি আজীবন চিরঋণী আমার মা রশিদা বেগম এর কাছে যিনি এখনো পর্যন্ত আমাকে উচ্চশিক্ষা লাভের অনুপ্রেরণা জুগিয়ে চলেছেন। ধন্যবাদ জানাই আমার একমাত্র ছোট ভাই শেখ রকি বক্সকে। এছাড়াও ধন্যবাদ জানাই আমার বাড়ির সকল সদস্যকে যিনাদের সুন্দর ব্যবহার আমাকে একটি সুন্দর পরিবেশ প্রদান করেছে, যাহার ফলে আমি আমার গবেষণার কাজ সুস্থ ভাবে সম্পাদন করতে পেরেছি। ধন্যবাদ জানাই আমার গ্রামের বন্ধু মালিক রহমান ও সকিরুল শেখ কে যিনারা আমার এইকাজ সৌন্দর্য প্রদানে সাহায্য করেছে।

অবশেষে ধন্যবাদ জানাই আমার বাল্যবন্ধু আলোকে যার শিশুসুলভ আচরণ, শান্ত মনোভাব ও সরলতা আমার জীবনে আসা কঠিন সময়গুলোকে সহজ করতে সব সময় সাহায্য করেছে।

এই গবেষণায় অযাচিত শব্দের ব্যবহার, বানান ভুল ইত্যাদি বিষয়কে যথারিত এড়িয়ে চলার চেষ্টা করা হয়েছে। তার পরও যদি এই রকম কোন ভুল থেকে থাকে তবে তার দায়ভার সম্পূর্ণ আমার নিজস্ব।

সেখ রাসিদুল হাসান

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

যাদবপুর, কলকাতা, ৭০০০৩২

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা নং

১. ভূমিকা **১-৬**

১.১ সমস্যা নির্বাচন

১.২ অনুকল্প রচনা

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য

১.৪ সাহিত্য পর্যালোচনা

১.৫ গবেষণা পদ্ধতি

১.৬ অধ্যায় বিভাজন

১.৭ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

২. শ্রেণী সংগ্রামে কৃষক সম্প্রদায়ের গুরুত্ব প্রসঙ্গে মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন ও মাও **৭-৩০**

২.১ মার্কসের মতানুসারে শ্রেণি সংগ্রামের কৃষক সম্প্রদায়

২.১.১ ভূমিকা

২.১.২ মার্কস যে সমস্ত গ্রন্থে কৃষক সম্প্রদায় সম্পর্কে বক্তব্য রেখেছেন

২.২ লেনিনের মতে শ্রেণিসংগ্রামে কৃষক সম্প্রদায়

২.৩ মাও সে তুং এর মতে শ্রেণিসংগ্রামে কৃষক সম্প্রদায়

২.৪ ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রেণিসংগ্রামে কৃষক সম্প্রদায় ও বাম দলগুলির বিকল্প নীতি গ্রহণ

৩. পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী সরকারের ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৯০ এর মধ্যবর্তী সময়ে নেওয়া কৃষিনীতি **৩১-৫০**

৩.১ ভূমিসংস্কার

৩.২ অপারেশন বর্গা

৩.২.১ অপারেশন বর্গার সাফল্য

৩.২.২ অপারেশন বর্গার তাত্ত্বিক অবস্থান ও বিতর্ক

৪. পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের ১৯৯০ এর পর নয়া কৃষি নীতি ও বিশ্বায়ন **৫১-৭০**

৪.১ নয়া কৃষি নীতির ধারণা

৪.২ নয়া কৃষি নীতি প্রয়োগে সমস্যা

৪.৩ নয়া কৃষি নীতির পরিপ্রেক্ষিতে সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের জমি অধিগ্রহন

৫. উপসংহার **৭১-৮০**

৬. সহায়ক পাঠ **৮১-৮৬**

ভূমিকা

১.১ সমস্যা নির্বাচন

১.২ অনুকল্প রচনা

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য

১.৪ সাহিত্য পর্যালোচনা

১.৫ গবেষণা পদ্ধতি

১.৬ অধ্যায় বিভাজন

১.৭ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

১.১ সমস্যা নির্বাচন -

রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কৃষক শ্রেণীর অগ্রণী ভূমিকার কথা বিশ্বের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। কিন্তু মার্কসবাদী আলোচনায় সমাজতন্ত্রে উপনীত হওয়ার জন্য শ্রেণী সংগ্রামের ক্ষেত্রে শ্রমিক শ্রেণীকে গুরুত্ব প্রদান করা হয় বৃহত্তর অর্থে, যার ফলে কৃষক শ্রেণী এখানে আপেক্ষিক হয়ে পড়ে। কিন্তু এই কৃষক শ্রেণীর একটি ইতিবাচক প্রভাব সমাজের মধ্যে সব সময় রয়েছে যা উহ্য হয়ে পড়ে। বামপন্থীদের দুর্গ হিসেবে পরিচিত পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার একাধিক্রমে তিন দশকেরও বেশি ক্ষমতাশীন ছিল। প্রথমদিকে বামফ্রন্ট সরকার বিভিন্ন কৃষিমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করলেও সময়ের সাথে সাথে তাদের কাছেও কৃষক সম্প্রদায় এক রকম আপেক্ষিক হয়ে ওঠে ফলে এখানেও কৃষক শ্রেণীর গুরুত্ব উহ্য হয়ে পড়ে।

১.২ অনুকল্প রচনা -

আধা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যযুক্ত ভারতবর্ষে শ্রেণি সংগ্রামের মূল ভিত্তি হিসেবে কৃষক শ্রেণীকে প্রাধান্য দেওয়ার মধ্যে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসলেও নির্দিষ্ট একটা সময়ের পর তারা এই কৃষক শ্রেণীকে তাদের আলোচনার বৃত্তের বাইরে রাখে বলে আমার মনে হয়। গবেষণা করতে গিয়ে যে বিষয়গুলিকে গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করা হয়েছে, সেগুলি হল-

প্রথমতঃ ১৯৭৭ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত বামফ্রন্ট সরকারের নেওয়া কৃষিনীতি গুলি ততখানি নিচুস্তরের কৃষক সম্প্রদায়ের উন্নয়ন সাধন করতে পারেনি বা তার উন্নয়নের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণ করতে পারেনি।

দ্বিতীয়ত, ১৯৯০ সালের পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের নেওয়া কৃষিনীতি গুলি এক প্রকার কৃষক সম্প্রদায়ের বিপক্ষেই ছিল, যার পরিপ্রেক্ষিতে বামফ্রন্ট সরকার ৩৪ বছর ক্ষমতায় থাকলেও কৃষক সম্প্রদায়ের অবস্থান বুঝতে তারা অক্ষম বলে মনে হয়।

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য -

আমার এই গবেষণা পত্রের মূল উদ্দেশ্য হল প্রথমত, মার্কসের নিজস্ব লেখার মধ্যে কৃষক সম্প্রদায়ের যে গুরুত্ব ছিল তা তুলে ধরা এবং মার্কসীয় মতাদর্শে বিশ্বাসী পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী সরকার কৃষক সম্প্রদায়ের জন্য নেওয়া কৃষি নীতিগুলি কতটা কৃষক সম্প্রদায়ের উন্নয়ন সাধন করেছে এবং কতটা মার্কসীয় মতাদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ তা তুলে ধরা।

১.৪ সাহিত্য পর্যালোচনা -

মার্কসবাদী আলোচনা বা পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী সরকারের অবস্থানের সময় কালে কৃষক ও কৃষি অর্থনীতি সম্পর্কিত আলোচনার উপর গবেষণা হলেও সেই কৃষি অর্থনীতি কতটা মার্কসবাদী আলোচনার সামঞ্জস্যপূর্ণ সে সম্পর্কিত কোন পূর্ণাঙ্গ গবেষণা হয়নি। তবে বিক্ষিপ্তভাবে এই সম্পর্কে যে সব গবেষণা মূলক গ্রন্থ রয়েছে সেগুলো কে যথাযথ ভাবে বিচার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, ইয়েভগেনিয়া স্তেপানভার লেখা ‘কার্ল মার্কসঃ এ শর্ট বায়োগ্রাফি’ গ্রন্থ, যেখানে স্তেপানভার মার্কসের বাল্যকাল থেকে শুরু করে একদম তার লেখা শেষ গ্রন্থ পর্যন্ত সমগ্র আলোচনাকে উপস্থাপন করেছেন সহজ সরল ভাষায় এবং তার লেখা সমস্ত গ্রন্থ মধ্যে যে সমস্ত মূল বিষয় রয়েছে সে গুলোকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। মার্কসের বয়সের সাথে সাথে তার লেখা গুলোকে এমন ভাবে সাজানো সাজানো হয়েছে এই গ্রন্থে যার মধ্যে দিয়ে মার্কসের লেখাগুলিতে কোন কোন ক্ষেত্র গুরুত্ব পেয়েছে, তার স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় এই গ্রন্থের মধ্যে।

সুবীর মজুমদার সম্পাদিত ‘ভি আই লেনিনঃ এ শর্ট বায়োগ্রাফি’ গ্রন্থের মধ্যে শ্রেণীসংগ্রামের আলোচনায় কৃষক সম্প্রদায়ের যে ভূমিকা রয়েছে তা এখানে তিনি তুলে ধরেছেন যদিও আলাদা ভাবে কোন অংশকে ব্যাখ্যা করা এই গ্রন্থে নেই, কিন্তু লেনিনের সমগ্র আলোচনাকে এখানেও এমন ভাবে সাজানো হয়েছে যেখান থেকে বোঝা যায় যে লেনিন শ্রেণীসংগ্রামের ধারণাকে রাশিয়ায়

প্রতিষ্ঠা করার জন্য কৃষক শ্রেণীর যে গুরুত্ব রয়েছে তা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন তার লেখার মধ্যে দিয়ে।

মাজহারুল ইসলাম সম্পাদিত 'মাও সে তুং এর নির্বাচিত রচনাবলী' (প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ খন্ড) গ্রন্থে, চীনের পরিপেক্ষিতে মার্কসবাদী আলোচনায় শ্রেণীসংগ্রামের কৃষক শ্রেণীর যে ভূমিকা ব্যাপক এবং কৃষক শ্রেণী যে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করবে সেই সম্পর্কিত আলোচনা ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে এই গ্রন্থের মাধ্যমে, কৃষক শ্রেণীকে নিয়ে মাওয়ের 'নয়া গণতান্ত্রিক' ধারণার ক্ষেত্র এখানে পরিলক্ষিত হয়েছে। হরে কৃষ্ণ সিং সুরজিতের 'ল্যান্ড রিফর্ম ইন ইন্ডিয়াঃ প্রমিসেস এন্ড পারফরম্যান্স'-এর সপ্তম অধ্যায়ে 'লেফটিস্ট গভমেন্ট এন্ড ল্যান্ড রিফর্ম পলিসি' সংক্রান্ত আলোচনায় বিস্তারিত ভাবে পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী সরকারের প্রথম কৃষি নীতি ভূমি সংস্কার ও তার উন্নত রূপ 'অপারেশন বর্গা' সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। রস মল্লিকের লেখা গ্রন্থ 'ডেভলপমেন্ট ইথনিসিটি এন্ড হিউম্যান রাইটস ইন সাউথ এশিয়া' গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি পশ্চিমবঙ্গের 'স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা'র পরিপ্রেক্ষিতে 'ভূমি সংস্কার' ও 'অপারেশন বর্গা' সম্পর্কিত আলোচনা করেছেন এবং সমালোচনা মূলক আলোচনা তুলে ধরেছেন। রাখহরি চ্যাটার্জী, পার্থপ্রতিম বসু সম্পাদিত 'ওয়েস্টবেঙ্গল আন্ডার দা লেফট'(1977-2011) গ্রন্থে, পার্থপ্রতিম বসু রচিত 'এগ্রিকালচার আন্ডার দা লেফট ফ্রন্ট ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল' অংশে, বামফ্রন্টের সময়ে কৃষি নীতির ফলে কৃষকদের কি সাফল্য বা প্রাপ্তি রয়েছে তা তুলে ধরেছেন এবং এর সাথেই বামপন্থী সরকারের ভূমি সংস্কারের মধ্যে যে আদর্শগত বিতর্ক রয়েছে তা তুলে ধরেছেন এবং নয়া কৃষি অর্থনীতির প্রভাব সম্পর্কিত আলোচনা তিনি সংক্ষিপ্ত ভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। টোডরমল সম্পাদিত 'পশ্চিমবঙ্গ ভূমিসংস্কার আইন' নামক গ্রন্থে, পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইন ১৯৫৫ সালের জমির রাজস্ব আইন ১৯৭৯ এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন, এই আইনের অর্থকে যথাযথভাবে মাতৃভাষায় সরকারি কাজে ব্যবহার করার জন্য তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। প্রভাত দত্ত সম্পাদিত 'আঞ্চলিক রাজনীতি উন্নয়ন ও বিকেন্দ্রীকরণ' গ্রন্থে সংসদীয় ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতার মধ্যেও কিভাবে বামপন্থী সরকার পশ্চিমবঙ্গের কৃষি উন্নয়নের দিকে অগ্রসর হয়েছে তা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। রতন খাসনবিশ সম্পাদিত 'ভারতের মাওবাদী রাজনীতি' নামক প্রবন্ধ সংকলনে, 'রাষ্ট্র সমাজ ও বিপ্লব' সংক্রান্ত প্রবন্ধে রতন খাসনবিশ দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে ভারতবর্ষের

ইতিহাসে কেন বামপন্থা দলগুলি বিকল্প পথ গ্রহণ করেছে। অঞ্জন বেরা সম্পাদিত 'জ্যোতি বসুর নির্বাচিত রচনা সমগ্র' (প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম খন্ড) গ্রন্থে, ৩৪ বছরের বামপন্থী সরকারের আলোচনার প্রেক্ষাপটকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। রণেশ রায় রচিত 'ভারতের অর্থনীতিঃ সমকালীন ভারতের অর্থনীতির গোষ্ঠীচরিত্র' নামক গ্রন্থে, ভারতবর্ষের নয়া কৃষি অর্থনীতি বিশ্বায়নের পরিপ্রেক্ষিতে কিভাবে পশ্চিমবঙ্গের কৃষি অর্থনীতির উপর প্রভাব ফেলেছে তা বিস্তারিত আলোচনার সাথে ভারতবর্ষের সমগ্র অর্থনীতি সম্পর্কিত আলোচনা করেছে। অজিত নারায়ন বসুর 'পশ্চিমবঙ্গ কৃষি যা হয়ে চলেছে এবং যা হওয়া সম্ভব' অনিক, অক্টোবর নভেম্বর ২০০১, প্রবন্ধে 'অপারেশন বর্গা' সম্পর্কিত আলোচনা মার্কসবাদী আলোচনা থেকে কতটা দূরে অবস্থান করে তা তুলে ধরার চেষ্টা করেছে।

উপরিউক্ত পুস্তক পুস্তিকাগুলি পর্যালোচনা করে এ কথা বলা যেতে পারে যে এই পুস্তকগুলিতে শ্রেণীসংগ্রামের বা কৃষক আন্দোলনের বা কৃষক শ্রেণীর অবস্থানের এক একটি দিক আলোচিত হয়েছে। এগুলিতে লেখকের নিজস্ব চিন্তাভাবনা দিয়ে মার্কসবাদী মতবাদ, ভারতের বামপন্থী আলোচনা, পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী আলোচনা ও কৃষকের অবস্থানকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের কৃষি নীতিকে মার্কসীয় কৃষি ধারণার নিরিখে কেউই সেই অর্থে আলোচনা করেন নি। সে দিক থেকে এই গবেষণাপত্রটি নিশ্চিতভাবেই অভিনবত্বের দাবি রাখে।

১.৫ গবেষণা পদ্ধতি -

গবেষণার প্রয়োজনে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা আবশ্যক। বর্তমান গবেষণার প্রকৃতি যেহেতু অভিজ্ঞতামূলক ও অনুস্তরীয় বিশ্লেষণের পরিসরে বিন্যস্ত সেহেতু গবেষণার স্বার্থে মুখ্য ও গৌণ তথ্যসমূহ সংগ্রহ করা হয়েছে। এখানে মুখ্য উৎস বা প্রাইমারি সোর্স হিসেবে সিপিআইএমের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শাখা কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন ও প্রস্তাব গুলোকে তথ্য সংগ্রহের কাজে ব্যবহার করা হয়েছে, আবার গৌণ উৎস বা সেকেন্ডারি সোর্স এর মধ্যে রয়েছে- পুস্তক পুস্তিকা, প্রবন্ধ, পত্র-পত্রিকা ও সাময়িক পত্রিকা এবং সংবাদপত্র।

এইভাবে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্যগুলিকে বিশ্লেষণ বা ডাটা এনালাইসিস করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং সেগুলিকে যথাযথভাবে প্রক্রিয়াকরণ বা ডেটা প্রসেসিং এবং সংগৃহীত তথ্যের যথার্থ নিরূপণের জন্য যথাসম্ভব প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে এবং পরিশেষে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে অনুকল্প যথার্থ কিনা তা পরীক্ষা করে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে।

১.৬ অধ্যায় বিভাজন -

গবেষণা পত্রটিকে নিম্নলিখিত চারটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে -

প্রথম অধ্যায় - এখানে আলোচনা করা হয়েছে মার্কস ও এঙ্গেলসের মতে কৃষি প্রশ্ন ও তাদের অবস্থানগত ধারণা, লেনিন এবং মাও কিভাবে কৃষি ও কৃষি ক্ষেত্রের উপর গুরুত্ব দিয়েছে তা আলোচনা করা হয়েছে। ভারতের বামপন্থীদল গুলি কি ভাবে কৃষিকে গুরুত্ব দিয়েছে তার রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে এবং সর্বশেষে এই অধ্যায় ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে যে সমস্ত সীমাবদ্ধতা গুলির সম্মুখীন হয়েছিল ভারতের বামপন্থী দলগুলি তা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় - এখানে পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী সরকারের ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৯০ এর মধ্যবর্তী সময়ে যে কৃষিনীতি নেওয়া হয়েছে, তার আদর্শগত অবস্থান এবং তা প্রয়োগে যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে তা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে, এখানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ‘অপারেশন বর্গা’ ও তাকে নিয়ে যে বিতর্ক তা প্রাধান্য পেয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় - এখানে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের অর্থনৈতিক নীতি কিভাবে বিশ্বায়নের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার কিভাবে তাদের অর্থনৈতিক নীতির পরিবর্তন করার চেষ্টা করেছে তা তুলে ধরার ও বিশ্লেষণ করার চেষ্টা এই অধ্যায় করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় - এই অধ্যায়ের মধ্যে সমগ্র আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বামপন্থী সরকার এবং মার্কস এর নিজস্ব ধারণায় কৃষি অর্থনীতির সঙ্গে শ্রেণীসংগ্রামের যে ধারণা এবং তার যে বাস্তবিক

ক্ষেত্র তুলে ধরার চেষ্টা উপরে তিনটে অধ্যায়ে করা হয়েছে, তার মধ্যে দিয়ে নির্দিষ্ট একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

১.৭ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

এই গবেষণার ক্ষেত্রে বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে যা পর্যাপ্ত সময় ও অর্থের অভাবে সম্ভব হয়নি। সেগুলি হল, (ক) পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলার নিরিখে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। (খ) সময়ের অভাবে অনেক সাহিত্য পর্যালোচনা সম্ভবপর হয়নি। (গ) প্রাথমিক উৎস হিসেবে এই গবেষণার জন্য তেমন কোন সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।

*****

দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রেণী সংগ্রামে কৃষক সম্প্রদায়ের গুরুত্ব প্রসঙ্গে মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন ও মাও

২.১. মার্কসের মতানুসারে শ্রেণি সংগ্রামে কৃষক সম্প্রদায়

২.১.১. ভূমিকা

২.১.২. মার্কস যে সমস্ত গ্রন্থে কৃষক সম্প্রদায় সম্পর্কে বক্তব্য রেখেছেন

২.২. লেনিনের মতে শ্রেণিসংগ্রামে কৃষক সম্প্রদায়

২.৩. মাও সে তুং এর মতে শ্রেণিসংগ্রামে কৃষক সম্প্রদায়

২.৪. ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রেণিসংগ্রামে কৃষক সম্প্রদায় ও বাম দলগুলির বিকল্প নীতি গ্রহণ

দ্বিতীয় অধ্যায়

মার্কসের মতানুসারে শ্রেণি সংগ্রামের কৃষক সম্প্রদায়

ভূমিকাঃ-

মাত্র ২৪ বছর বয়সে রাইন সংবাদপত্রের (Rheinische Zeitung)[1] মধ্যে দিয়ে কার্ল মার্কস যে লেখনি শুরু করেন তা শেষ করেন এক চরম ভবিষ্যৎবাণী - 'প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্রের' মধ্যে দিয়ে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তার লেখার মধ্যে দিয়ে বারবার তিনি তুলে ধরেছেন এই প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর বক্তব্য। যদিও তিনি এই প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর কথা বলতে গিয়ে শ্রমিক শ্রেণীর উপর যে বেশি গুরুত্ব প্রদান করেছেন তা তার আলোচনা ও বিখ্যাত উক্তি গুলির মধ্যে দিয়েই পাওয়া যায়। তবে তিনি শ্রমিকশ্রেণীর উপর গুরুত্ব প্রদান করলেও নিম্নবর্গ হিসেবে কৃষক শ্রেণী, কারিগরি শ্রেণী ইত্যাদি শ্রেণীর বক্তব্য অল্পবিস্তর তুলে ধরেছেন, তার আলোচনার মধ্যে দিয়ে। এবং পরবর্তীতে যত সময় এগিয়েছে ততই তার লেখার ধাঁর বৃদ্ধি পেয়েছে। এবং ততই বেশি শ্রমিক শ্রেণী গুরুত্ব পেয়েছে, এমন কি 'শ্রেণীসংগ্রাম' সংক্রান্ত ধারণায় তিনি শ্রমিক শ্রেণীকে নেতৃত্ব প্রদানের কথা বলেছেন। ফলে তিনার বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে অন্য নিম্নবর্গীয় শ্রেণি গুলির গুরুত্ব উহ্য হয়ে পড়েছে। যদিও এই ক্ষেত্রটির মূল কারণ হলো- সমসাময়িক সময়ে অর্থাৎ উনিশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে 'প্রলেতারিয়েত'[2] শব্দটি সাধারণভাবে শ্রেণী হিসেবে 'মজুরি উপার্জনকারী' হিসেবে বোঝাত না অর্থাৎ মর্যাদার ক্ষেত্রে 'প্রলেতারিয়েতে'র সঙ্গে অপর শহরের 'কারিগর' অথবা 'কৃষি শ্রমিক'দের সামান্যই পার্থক্য করা হতো। পার্থক্য ছিল এই যে 'প্রলেতারিয়েত শ্রমিক'রা উপাদানের হাতিয়ার থেকে 'বঞ্চিত' ছিল। তাকে 'শ্রম' করতে হতো নিজের জন্য নয় (কৃষক এবং কারিগরদের মত), অপরের লাভের জন্য। পুঁজির মালিকের লাভের

[1] কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিক এঙ্গেলস, রচনাবলী, খণ্ড-১, পৃঃ-৩-২৭

[2] কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিক এঙ্গেলস; কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টঃ দি.রিয়াজনভ কতৃক রচিত, ভি.জি. কিয়েনান সম্পাদিত সংস্কার অবলম্বনে।

জন্য। সে বিক্রি করে নিজেকে, নিজের শ্রম শক্তিকে, যেন এক ধরনের ‘পণ্যে’র মত এবং বিনিময় গ্রহণ করে ‘মজুরি’।

এঙ্গেলস লিখেছেন যে, ব্যাপক ভিত্তিতে যন্ত্রে উৎপাদন শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত শহরের কারিগর ও গ্রামের গৃহকর্মের শ্রমিকরা সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হয়ে যায়নি। তাদেরকে ধীরে ধীরে প্রলেতারিয়েতের দলে ঠেলে দেওয়া হয় এবং এই ভাবে তারা পুরাতন ব্যবস্থায় ফিরে যাবার সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত হয়। ব্যাপক যন্ত্রে উৎপাদনের প্রচলন থেকে এক শ্রেণীর মানুষ সৃষ্টি হয়, যারা নিজের দেহটাকে বাজারে নিয়ে আসে এবং চাকরির সন্ধানে এক প্রতিযোগিতার আবর্তে নিজেকে আবদ্ধ করে।[3] আর এই অংশগ্রহণ হলো- বাঁচার জন্য, অস্তিত্বের জন্য, সমস্ত কিছুর জন্য। ফলে মার্কসের আলোচনায় অন্য নিম্নবর্গের শ্রেণীর তুলনায় প্রলেতারিয়েত হিসেবে শ্রমিকশ্রেণীকে গুরুত্ব প্রদান করেছেন কারণ শ্রমিক শ্রেণীর কাছে তার নিজের দৈহিক শ্রম ব্যতিত আর কোন ধরনের সামাজিক সম্পত্তির মালিকানা ছিল না।

মার্কস যে সমস্ত গ্রন্থে কৃষক সম্প্রদায় সম্পর্কে বক্তব্য রেখেছেন -

উনিশ শতকের চতুর্থ থেকে ষাটের দশকে কার্ল মার্কসের লেখা বিখ্যাত গ্রন্থ গুলিতে বারবার শ্রেণী শোষণের ধারণা উঠে এসেছে তার কারণ হলো- শিল্প বিপ্লবের ফলে প্রচুর পরিমাণ কলকারখানার উপস্থিতি। যেখানে শ্রমিক শ্রেণী নির্দিষ্ট একটি সময় কাজ করার বিনিময়ে মজুরি পেত, যে মজুরি দিয়ে তাদের দৈনন্দিন জীবন পরিচালনা ছাড়া আর কিছু সম্ভব ছিল না। আর এই অংশটির উপরই মার্কসের লেখনীতে গুরুত্ব পেয়েছে। কিন্তু তিনি এই আলোচনার সাথে সাথে কৃষি অর্থাৎ কৃষক সম্প্রদায়ের কথাও বলেছেন- তার প্রথম দিকের লেখাতে। প্রাথমিকভাবে তিনি রাইনের ১৮৪২-৪৩ এ ষষ্ঠ প্রতিনিধি সভার তর্কবিতর্ক পর্যায়ে তার লেখা তৃতীয় প্রবন্ধে- বনসম্পদ অপহরণ বিষয়ক আইন উপলক্ষে উত্থাপিত বাদানুবাদ বিশ্লেষণ করে মার্কস বনসম্পদ মালিকদের

[3] এঙ্গেলস, লাজে প্রভৃতি, পৃঃ-৭৭-৭৮,(ইংরেজি অনুবাদ পৃঃ-৭৫-৭৬)

হাতে শোষিত কৃষক জনসাধারণকে সমর্থন জানিয়েছেন।[4] এবং 'মোসেলের সংবাদদাতার কৈফিয়ৎ' প্রবন্ধে তথ্যমূলক উপাদানের ভিত্তিতে মার্কস মোসেলের মদ্য প্রস্তুতকারী কৃষকদের সর্বশান্ত অবস্থার চিত্র আঁকেন এবং কৃষক সম্প্রদায়ের অবস্থা সম্পর্কে সত্য গোপনে যারা প্রয়াসী, তিনি সেই নির্দয় ও মিথ্যাচারী প্রুশিয় আমলাতন্ত্রের মুখোশ খুলে দিয়েছেন। পরবর্তী সময়ে যখন খাঁটি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ব্যক্তিবর্গের দ্বারা প্রকাশিত ১৮৪৬ সালে নিউইয়র্ক (Volks-Tribun)[5] বা গণ ট্রিবিউন সংবাদপত্রের সম্পাদকের হেমান ক্রিগের বিরুদ্ধে তাঁদের লেখা সার্কুলারটি, কৃষি প্রশ্নে ক্রিগের ইউটোপিয় দৃষ্টিভঙ্গি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বৃহৎ জমির মালিকানার বিরুদ্ধে চরিত্রগত ভাবে পেটিবুর্জোয়া আন্দোলনকে, কমিউনিস্ট আন্দোলন হিসেবে দেখানোর জন্য তার(ক্রিগের) প্রয়াস সমালোচিত হয়েছিল সার্কুলারে।

১৯৪৭ সালে (Deutsche Brusseler Zeitung)[6] 'জার্মান ব্রাসেল সংবাদপত্রে' রণনীতি ও কর্মকৌশল প্রশ্নের উত্তরে এবং প্রাশিয়ার স্বৈরতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রকে যে শক্তি চূড়ান্তভাবে দমন করার মতো ক্ষমতা রাখতে পারে বলে মনে করত তারা হলেন- প্রলেতারিয়েত, ক্ষুদ্র কৃষক সম্প্রদায়। জার্মানিতে কমিউনিস্ট পার্টির দাবি সমূহের মধ্যেও মার্কস তার মাত্র ২১ বছর বয়সেই জমিদারি ভূমি মালিকানার উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে কমিউনিস্টদের কৃষি কর্মসূচি যথা- মুক্তি পণ ছাড়া যাবতীয় সামন্ততান্ত্রিক বাধ্যতামূলক বেকার থেকে কৃষি সম্প্রদায়ের মুক্তি, সমস্ত রকম রাজকীয় ভূ-সম্পত্তি, সামন্তের অধীনস্থ তালুক, কৃষকদের উপর ক্ষুদ্র মালিক ও রায়ের ওপর পুঁজিবাদী শোষণ সমীকরণের উদ্দেশ্যের উপর ব্যবস্থা গ্রহণের মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্রের দিকে প্রথম পদক্ষেপের অর্থবহ বলে উল্লেখ করেন এবং এই দাবিগুলি রূপায়ণের জন্য সংগ্রামের সমর্থক সামাজিক শক্তি মার্কস ও এঙ্গেলস দেখতে পান প্রলেতারিয়েত ও তার ঘনিষ্ঠ মিত্রবর্গ- পেটিবুর্জোয়া ও ক্ষুদ্র কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে, সুতরাং রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জার্মানির ভবিষ্যত বিকাশের ভাগ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিচের স্তরের ঐক্যের ক্ষেত্রে কৃষক সম্প্রদায় গুরুত্ব পায়। ১৯৪৮ সালে পরবর্তী

[4] কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিক এঙ্গেলস, রচনাবলী, খণ্ড-১, পৃঃ-৩-২৮

[5] কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিক এঙ্গেলস, রচনাবলী, খণ্ড-৪, পৃঃ-১-১৬

[6] কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিক এঙ্গেলস, রচনাবলী, খণ্ড-৪, পৃঃ-৩১৩।

সময়ে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য সংগ্রামের উদ্দেশ্যে মার্কস লেখেন- 'বাস্তিল এখনো দখল করা হয়নি'।[7]

মার্কস জনগণের সামনে তুলে ধরেছেন জনগণের বিপ্লবী একনায়কত্ব শ্লোগান, এক প্রকৃত শাসন ক্ষমতার শ্লোগান, যে শাসন ক্ষমতা মধ্যযুগীয় জঞ্জাল পরিষ্কার ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে সক্ষম। মার্কসের মতে বুর্জোয়া শ্রেণীর বেইমানি প্রকাশ পায় কৃষক সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্ক ক্ষেত্রে তার রাজনীতিতে। মার্কস উল্লেখ করেছেন বুর্জোয়া শ্রেণীকে এতদূর অন্ধকার করে দেয় যে সে তার 'অত্যাবশ্যক মিত্র' কৃষক সম্প্রদায়কে নিজের কাছ থেকে দূরে ঠেলে দেয়।[8]

কৃষক সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষার দায়িত্ব তুলে নিল Neue Rheinische Zeitung (নিউ রাইন পত্রিকা), আর এইভাবে সে কৃষক জনসাধারণের সঙ্গে প্রলেতারিয়েতের জোটের, বিপ্লবী সংগ্রামে প্রলেতারিয়েতের মুখ্য ভূমিকা পথ নির্মাণ করল। ১৮৪৭ সালে অর্থনৈতিক সংকটের পরিনামের মধ্যে শিল্প-পুঁজিবাদের প্রথম পর্বের স্বভাব অনুযায়ী শ্রমিক শোষণের বিশেষ নির্মম উপায়ের মধ্যে, ব্যাপকভাবে কারুজীবিদের দুর্দশা প্রাপ্তি এবং কৃষক সম্প্রদায়ের অবস্থার অবনতির মধ্যে মার্কস ও এঙ্গেলস সেই সময় লক্ষ্য করেছেন প্রলেতারিয়েত বিপ্লবের মূল শর্ত। মার্কস দেখিয়েছেন যে কৃষক সম্প্রদায় স্বার্থ সম্পর্কে সঠিক ধারণা তাকে অবশ্যই প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার দিকে ঠেলে দেবে, এইভাবে ফ্রান্সের শ্রেণী-সংগ্রামের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মার্কস প্রলেতারিয়েতের মিত্রদের সম্পর্কিত প্রশ্নের উপর জোর দেন এবং বিপ্লবী সংগ্রামের প্রলেতারিয়েতের নেতৃত্ব মূলক ভূমিকার সঙ্গে সঙ্গে কৃষক সম্প্রদায়ের সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর জোটবদ্ধতার অবশ্য প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অতি গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গঠন করেন।[9]

---

[7] কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিক এঙ্গেলস, রচনাবলী, খণ্ড-৫, পৃঃ-৪০১-৪০৩।

[8] কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিক এঙ্গেলস, রচনাবলী, খণ্ড-৬, পৃঃ-১০১।

[9] কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিক এঙ্গেলস, রচনাবলী, খণ্ড-৭, পৃঃ-৯১

মার্কসের অন্য একটি রচনা- 'লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার'- এও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিহিত আছে। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বোনাপার্ট যে কৃষক সম্প্রদায়কে নিজের দলে টানতে পেরেছেন তার কারণ স্বরূপ মার্কস লক্ষ্য করেছেন, কৃষকদের সীমাবদ্ধতার দৃষ্টিক্ষমতা শহরের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন থেকে তাদের বিচ্ছিন্নতা, পরস্পরের বিচ্ছিন্নতা এবং পরিশেষে, প্রথম নেপোলিয়ন সম্পর্কে এক বিশেষ ধরনের ভক্তি, যা তারা আরোপ করে তার ভ্রাতৃ পুত্রের উপর। সেই সঙ্গে মার্কস উদ্ঘাতন গঠন করেন কৃষকের দুমুখো প্রকৃতি- সে নিজের জমি টুকরো আঁকড়ে ধরে আছে অথচ ক্রমেই বেশি করে পুঁজির নির্যাতনের কবলে পড়ছে। মার্কস দেখান যে বোনাপার্ট রাজবংশ - বিপ্লবী কৃষকের প্রতিনিধি নয়, সে হলো রক্ষণশীল কৃষকের, সে তার জ্ঞানালোকের নয়, অন্ধ বিশ্বাসের প্রতিনিধি, তার বিচার বুদ্ধির নয়, কুসংস্কারের প্রতিনিধি। তার ভবিষ্যতের নয়, অতীতের প্রতিনিধি।[10] কুসংস্কার যদি তাকে বোনাপার্টের দিকে ঠেলে দিয়ে থাকে তাহলে বিচার, বুদ্ধি, স্বার্থ সম্পর্কে সঠিক বোধ তাকে অবশ্যই প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে জোট বাঁধতে প্রবৃত্ত করবে। 'কৃষকেরা... নিজেদের স্বাভাবিক মিত্র ও নেতা খুঁজে পায় শহরের প্রলেতারিয়েতের মধ্যে, যার কাজ হলো বুর্জোয়া ব্যবস্থার উচ্ছেদ ঘটানো'।[11] ১৮৫৬ সালে তিনি এঙ্গেলসকে লেখেন - জার্মানির গোটা ব্যাপারটা নির্ভর করে কৃষক যুদ্ধের কোন দ্বিতীয় সংস্করণের দ্বারা প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবকে সমর্থন করার সম্ভাবনার উপর। এই আলোচনায় প্রলেতারিয়েতের নেতৃত্বমূলক ভূমিকা এবং কৃষক সম্প্রদায়ের সঙ্গে তার জোটবদ্ধতা সম্পর্কে মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মকৌশল এর ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অবদান বলে মনে হয়।

১৮০৮-১৮১৪, ১৮২০-১৮২৩ এবং ১৮৩৪-১৮৪৩ এর স্পেনের বিপ্লবের ইতিহাস সম্পর্কে চর্চায় মনোনিবেশ করেন, এবং 'বিপ্লবী স্পেন'[12] শীর্ষক প্রবন্ধ রচনা করেন এবং ১৮২০-২৩ সালের

[10] কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিক এঙ্গেলস, রচনাবলী, খণ্ড-৮, পৃঃ-২০৯

[11] কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিক এঙ্গেলস, রচনাবলী, খণ্ড-৮, পৃঃ-২১১

[12] কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিক এঙ্গেলস, রচনাবলী, খণ্ড-১০, পৃঃ-৪৩৩-৪৩৪

বুর্জোয়া বিপ্লব এর পরাজয় বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে মার্কস তার মূল কারণ স্বরূপ দেখতে পান যে, 'বিপ্লবী পার্টি শহরের আন্দোলনের সাথে কৃষক সম্প্রদায়ের স্বার্থের সংযোগ ঘটাতে পারেন নি'।[13]

১৮৬৩-১৮৬৪ সালের পোলিশ অভ্যুত্থান প্রসঙ্গে মার্কস কৃষক শ্রেণীর গুরুত্ব তুলে ধরে বলেছেন- যখন কৃষি বিপ্লবের প্রসার ঘটবে, জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম যখন গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ সূত্রে আবদ্ধ হবে, একমাত্র তখনই পোলদের স্বাধীনতা সংগ্রাম সাফল্য মণ্ডিত হবে।[14] এছাড়াও কার্ল মার্কসের লেখনীর মধ্যে রাশিয়ার কৃষি সংস্কার প্রসঙ্গে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গৃহযুদ্ধ প্রসঙ্গে কৃষক সম্প্রদায় সম্পর্কে তার বক্তব্য তুলে ধরেন।

১৮৭৩ সালে বা বাকুনিন লেখা গ্রন্থ- 'রাষ্ট্রসত্তা ও নৈরাজ্য' এর মধ্যে তিনি যখন উল্লেখ করেন যে- 'অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নয়, ইচ্ছাই হল সমাজ বিপ্লবের ভিত্তি।[15] এবং উত্তরাধিকার ব্যবস্থা বিলোপের যে প্রচার বাকুনিন পরিচালনা করেন, বিশেষত তার বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে মার্কস কৃষক সম্প্রদায়ের সঙ্গে ক্ষমতাশীল প্রলেতারিয়েতের সম্পর্কের ব্যাপারে বাকুনিন এর প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। মার্কস লেখেন, প্রলেতারিয়েতকে সরকার হিসেবে এমন সব ব্যবস্থা নিতে হবে, যার ফলে কৃষকের অবস্থার সরাসরি উন্নতি ঘটবে এবং পরিনামে তাকে বিপ্লবের দিকে আকর্ষণ করবে; সেগুলি হল এমন ব্যবস্থা যা অঙ্কুরেই জমির ব্যক্তিগত জমির মালিকানা থেকে যৌথ মালিকানার উত্তরণ সহজ করে তোলে আর তার ফলে কৃষক নিজেই এই অর্থনীতির পথ ধরে; কিন্তু উত্তরাধিকার প্রথা কিংবা তার সম্পত্তির অধিকার বিলোপের মতো ব্যাপার ঘোষণা করে তাকে চটিয়ে দেওয়া ঠিক হবে না....।[16] পরবর্তীকালে এঙ্গেলস ক্ষুদ্র কৃষিজীবী অর্থনীতি থেকে বৃহৎ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে উত্তরণের পথ সম্পর্কে তার নিজের ও মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গি বিকশিত করার সময় কৃষি অর্থনীতির পুনঃগঠনের সমবায় সমিতির ভূমিকার ওপর জোর দেন। ১৮৮৬ সালে

---

[13] কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিক এঙ্গেলস, রচনাবলী, খণ্ড-১০, পৃঃ-৬৩২

[14] দ্রঃ কার্ল মার্কস, 'পোলিশ প্রশ্নের ইতিহাস প্রসঙ্গে, ১৮৬৩-১৮৬৪ সনের পাণ্ডুলিপি, মার্কস- এঙ্গেলস মহাফেজখানা', খন্দ-১৪, ১৯৭৩

[15] কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিক এঙ্গেলস, রচনাবলী, খণ্ড-১৮, পৃঃ-৬১৫

[16] কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিক এঙ্গেলস, রচনাবলী, খণ্ড-১, পৃঃ-৬১২

এঙ্গেলস বেবেলকে লেখেন- '....পুরোপুরি কমিউনিস্ট অর্থনীতিতে উত্তরণের সময় অন্তর্বর্তী সংযোগ রূপে আমাদের যে বিস্তৃত পরিমানে সমবায়ী উৎপাদনের উপর আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে, এ ব্যাপারে আমার ও মার্কসের কখনই সন্দেহ ছিল না।[17]

সত্তর দশক থেকে শুরু করে মার্কসের দৃষ্টি প্রায়শই ও রাশিয়ার দিকে নিবদ্ধ হয় এই আশায় যে, রাশিয়া হল এমন এক দেশ যা ইউরোপে বিপ্লবের প্রেরনা যোগাবে। ১৮৭৭ সালে মার্কস জোগ্রকে লেখেনঃ এবারে বিপ্লব শুরু হবে প্রাচ্যে, যা এ যাবৎ ছিল প্রতিবিপ্লবের অক্ষত দুর্গ ও মজুত সেনাবাহিনী।[18] মার্কসের মহাপ্রতিভা সম্পন্ন দূরদৃষ্টির বিশেষ পরিচয় মেলে এতেই যে তার সময়কার অনগ্রসর এই যে দেশটি সবে শিল্প-পুঁজিবাদের পথে পা বাড়িয়েছে, তারই মধ্যে তিনি অনুমান করেন বিপুল সম্ভাবনাপূর্ণ এক বিপ্লবী শক্তির অস্তিত্ব। বিস্তারিত অধ্যায়নের পরে 'আমার গ্রন্থগারে রুশ' শিরোনামায় ১১৫ টিরও বেশি সূচির নেহাতই অসম্পূর্ণ যে তালিকা মার্কস প্রস্তুত করেন, তাতে ১৫০ টি সংস্করনের নাম পাওয়া যায়, যে গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভাবে স্থান পেয়েছে- কৃষি অর্থনীতির অবস্থা, কৃষি সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়।

কিন্তু উপরের সমগ্র আলোচনার উপর দৃষ্টি রেখো যদি কার্ল মার্কস ও এঙ্গেলসের সমগ্র আলোচনাকে উত্থাপিত করা হয় তবে দেখা যাবে যে কৃষি ব্যবস্থা তথা কৃষক সম্প্রদায়ের তুলনায় বারবার তাদের আলোচনায় শ্রমিক শ্রেণীর কথা উঠে এসেছে, ফলে শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবকে শক্ত ভাবে গড়ে তুলতে গিয়ে বার বার কৃষক সম্প্রদায়ের অবদানকে আপেক্ষিকভাবে তাদের অবস্থানের কথা স্বীকার করেছেন, অর্থাৎ তাদের আলোচনায় ছিন্ন ছিন্ন ভাবে প্রয়োজনে কৃষক সম্প্রদায়ের অবদানকে তুলে ধরেছেন কিন্তু সামগ্রিকভাবে কোন রূপ অবস্থান নিশ্চিত করেননি।

কিন্তু মার্কস পরবর্তী মার্কসীয় তাত্ত্বিক লেনিন ও মাও সে তুং এর আলোচনায় কৃষক সম্প্রদায়ের আলোচনার আরও দৃঢ় ভালোভাবে দেখা যায়।

---

[17] কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিক এঙ্গেলস, রচনাবলী, খণ্ড-৩৬, পৃঃ-৩৬১

[18] কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিক এঙ্গেলস, রচনাবলী, খণ্ড-৩৪, পৃঃ-২৩০

লেনিনের মতে শ্রেণিসংগ্রামে কৃষক সম্প্রদায়ঃ-

লেনিন সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্বের ধারণার বিশ্লেষণে সর্বহারা শ্রেণীর রাজনৈতিক শাসন হিসাবে এবং শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে পুঁজির ক্ষমতাকে উচ্ছেদ করার পদ্ধতি হিসেবে সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্বের মৌলিক চিন্তা ভাবনাটি তুলে ধরেন, তিনি সর্বহারা শ্রেণীর মিত্রের সমস্যার দৃষ্টিকোণ থেকে সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্বের সূত্রের ব্যাখ্যা দান করেন, সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্বকে সংজ্ঞায়িত করেন- 'পরিচালক' হিসেবে 'সর্বহারা শ্রেণী' আর 'পরিচালিত' হিসেবে 'অ-সর্বহারা শ্রেণীর সমূহে'র (কৃষক ইত্যাদি) শোষিত জনগণের মধ্যেকার শ্রেণী-মৈত্রীর বিশেষ রূপ হিসেবে।[19] তিনি খুঁজে বের করেন অর্থনৈতিক কর্মনীতির সুনির্দিষ্ট লাইনগুলো (New Economic policy) যার দ্বারা সর্বহারা শ্রেণীর অর্থনৈতিক মূল অবস্থান গুলোর (শিল্প, জমি, পরিবহন, ব্যাংক ইত্যাদি) অধিকারী হওয়ার সুবাদে সমাজতান্ত্রিক শিল্পকে কৃষির সাথে সংযুক্ত করে (শিল্প ও কৃষক অর্থনীতির মধ্যে কার যোগসূত্র) এবং এভাবে সমগ্র জাতীয় অর্থনীতিকে সমাজতন্ত্রের দিকে পরিচালিত করে। তিনি খুঁজে বের করেন সমবায়ের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক বিনির্মাণের গতিপথে কৃষক সমাজের মূল অংশকে ক্রমান্বয়ে পরিচালনা করার ও টেনে নিয়ে আসার সুনির্দিষ্ট পন্থা, যে সমবায় হল সর্বহারা একনায়কত্বের হাতে ক্ষুদে-কৃষকের অর্থনীতির রূপান্তর সাধনের ও সমাজতন্ত্রের ভাবধারায় কৃষক সমাজের মূল অংশকে পুনঃ শিক্ষিত করে তোলার কাজে সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার।[20]

১৮৯৪ সালে গ্রীষ্মে লেনিন লেখেন- 'জনগণবন্ধুরা কি এবং কিভাবে তারা লড়ে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের বিরুদ্ধে?'[21] এ পুস্তকে তিনি নারদবাদীদের তাত্ত্বিক মতবাদের সর্বাঙ্গীণ (নারদবাদ হলো জনগণবাদ) সমালোচনা করে তাদের ভ্রান্তি ও অনিষ্ঠকরতা দেখান। সৃজনশীল মার্কসের শিক্ষার বিকাশ ঘটিয়ে ভ্রাদিমির ইলিচ লেনিন তাঁর গ্রন্থে এ ধারণা উত্থাপন করেন যে শ্রমিক শ্রেণী

[19] প্রথম মার্কিন শ্রমিক প্রতিনিধিদলের সাথে সাক্ষাৎকার থেকে উদ্ধৃতি অংশ; ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৭।(আনোয়ার সেরাজুল অনুদিত গণ প্রকাশন প্রকাশিত পুস্তিকা 'লেনিন ও লেনিনবাদ প্রসঙ্গে', এপ্রিল, ১৯৮৯।

[20] প্রাভদা, ২১০ নং; ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৭।(স্তালিন রচনাবলী, খন্দ-১০, রুশ সংস্করণ।

[21] মজুমদার,সুবীর(সম্পাদিত)ঃ ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন, সংক্ষিপ্ত জীবনীঃ প্রগতি প্রকাশন, মস্কো বাংলা অনুবাদ-পৃঃ-২০

ও কৃষক কুলের মধ্যে বৈপ্লবিক জোটই হলো গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের প্রধান শর্ত।[22] 'রাশিয়ার পুঁজিবাদের বিকাশ' নামক বইটিতে রাশিয়ার অর্থনৈতিক বিকাশ নিয়ে একটি বৃহৎ বৈজ্ঞানিক গবেষণা, যা সরাসরি মার্কসের 'পুঁজি' বইটির পূর্বানুসরণ। রাশিয়ার অর্থনীতি বিশ্লেষণ করে লেনিন নতুন প্রতিপাদ্য মার্কসীয় অর্থশাস্ত্রকে সমৃদ্ধ করেন। বাস্তব তথ্যের ভিত্তিতে তিনি দেখান যে রাশিয়ার পুঁজিবাদ শুধু শিল্পে নয়, কৃষিতেও জোরদার হচ্ছে। মার্কসীয় সাহিত্যে সর্বপ্রথম এই বইতেই পুঁজিবাদের আমলে কৃষকদের অবস্থা নিয়ে গবেষণা করা হয় এবং শ্রমিক ও কৃষকের মধ্যে জোটের জন্য এক গভীর অর্থনৈতিক মতবাদ উত্থাপন করা হয়।[23] ১৯০০ সালের ডিসেম্বরে প্রকাশিত হয় লেনিনের 'ইস্ক্রা'র প্রথম সংখ্যা 'স্ফুলিঙ্গ থেকেই আগুন জ্বলবে....' যেখানে শ্রমিক শ্রেণীর মত কৃষক শ্রেণীও সমান গুরুত্ব পেয়েছিল।[24] কৃষকদের কাছে পার্টির কর্মসূচি ব্যাখ্যার জন্য ১৯০৩ সালের বসন্তে লেনিন একটি পুস্তিকা লেখেন- 'গ্রামের গরিবদের প্রতি' এতে তিনি সহজ ও প্রাঞ্জল করে বোঝান কি চাইছে শ্রমিক পার্টি এবং কেন গরীব কৃষকদের ঐক্য দরকার শ্রমিকদের সাথে। লেনিন লেখেন আমরা স্থাপন করতে চাই সমাজের একটি নতুন, উন্নত ব্যবস্থা। এই নতুন সমাজে ধনী গরিব থাকা উচিত নয়, সকলেই কাজ করতে হবে। সাধারণ শ্রমের ফল ভোগ করবে মুষ্টিমেয় ধনীরা নয়, সমস্ত মেহনতীরা। এই নতুন, উন্নত সমাজকে বলা হয় 'সমাজতান্ত্রিক সমাজ'। আর এই মতবাদ কে বলা হয় 'সমাজতন্ত্র'।

লেনিন ও বলশেভিকরা রাশিয়ার ঘটমান বিপ্লবকে গণ্য করেছিলেন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব বলে। তার কর্তব্য হলো - ভূমিদাসপ্রথার বিলোপ, জারতন্ত্রের উচ্ছেদ এবং গণতান্ত্রিক অধিকার লাভ। লেনিনের কৃতিত্ব এই যে মার্কসবাদের ইতিহাসে তিনিই প্রথম সাম্রাজ্যবাদী যুগে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য, তার চালিকা শক্তি ও পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্নটিই বিচার করেন। বিপ্লবের প্রধান চালিকা শক্তি ও নেতা হতে হবে প্রলেতারিয়েতকেই। প্রলেতারিয়েতের সহযোগী

[22] মজুমদার,সুবীর(সম্পাদিত)ঃ ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন, সংক্ষিপ্ত জীবনীঃ প্রগতি প্রকাশন, মস্কো বাংলা অনুবাদ-পৃঃ-২৩

[23] মজুমদার,সুবীর(সম্পাদিত)ঃ ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন, সংক্ষিপ্ত জীবনীঃ প্রগতি প্রকাশন, মস্কো বাংলা অনুবাদ-পৃঃ-৩৯

[24] মজুমদার,সুবীর(সম্পাদিত)ঃ ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন, সংক্ষিপ্ত জীবনীঃ প্রগতি প্রকাশন, মস্কো বাংলা অনুবাদ-পৃঃ-৪৮

হল কৃষক সম্প্রদায়, যাদের স্বার্থ ছিল জমিদারদের হাত থেকে জমি হরণ ও জারতন্ত্রের ধ্বংস সাধন।

লেনিন বোঝালেন যে, জার স্বৈরতন্ত্র উচ্ছেদের নির্ধারক হলো সশস্ত্র অভ্যুত্থান। ভূতপূর্ব বিপ্লব গুলিতে যা হয়েছে সেভাবে বিজয়ী অভ্যুত্থান থেকে বুর্জোয়ার ক্ষমতা স্থাপন চলবে না, প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই বিপ্লবী গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব অর্থাৎ প্রলেতারিয়েত ও কৃষক সম্প্রদায়ের ক্ষমতা। তার সংগঠন হবে সামরিক বিপ্লবী সরকার। কিন্তু মেনশেভিকরা কৃষকদের বিপ্লবী শক্তিতে বিশ্বাস করত না, তাই তারা শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে কৃষক সম্প্রদায়ের ঐক্যের বিরোধী ছিল। কিন্তু লেনিন দেখালেন মেনশেভিকরা যে মূল্যায়ন করেছে তাতে মার্কসবাদী বিপ্লবী স্বার্থের বিকৃতি ঘটায়, তিনি বলেন- বিপ্লবী সংগ্রামের ভীত, বুলির বন্যায় বিপ্লবকে নিমজ্জিত করতে প্রস্তুত মেনশেভিকদের লেনিন যথার্থ বর্ণনা দিয়েছেনঃ 'মাফলার জড়ানো মানুষ' লেনিন তাঁর বইয়ে এই শিক্ষা দিয়েছেনঃ বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সমস্ত কৃষক সম্প্রদায়ের সঙ্গে একত্রে বিজয় অর্জন করার পর প্রলেতারিয়েত তাতেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে সে তার শক্তি সংগঠিত করে, গরীব কৃষক ও শহুরে গরিবদের স্বপক্ষে সম্মিলিত করে, আঘাত হানবে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে। পরবর্তী সময়ে ১৯০৪, ১৯০৫, ১৯০৬ সালের বিপ্লবী গণঅভ্যুত্থানে কৃষক শ্রেণী-কে লেনিন সমভাবে গুরুত্ব প্রদান করেছেন। লেনিন 'কমিউনিজমে বামপন্থা'র বাল্য ব্যাধি গ্রন্থে লিখেছেন- গণতান্ত্রিক বিপ্লবে নায়কের ভূমিকা জয় করেছে, নিপীড়িত শ্রেণীরা বিপ্লবী গণসংগ্রামের শিক্ষা পেয়েছে। শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে কৃষক সম্প্রদায়ের মিলন জোরদার করার তাৎপর্য যে কী বিপুল সে কথা বুঝিয়েছেন।[25] 'দূরের চিঠি'তে লেনিন দেখান যে তিনি সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা স্লোগান তুললেন, সোভিয়েত গুলির হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়ার জন্য, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি কে বিধ্বস্ত করা এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কাজে প্রস্তুতির জন্য শ্রমিক ও কৃষকের প্রতি সংগ্রামের আহ্বান জানালেন।[26] ৪ই এপ্রিল বলশেভিকদের সভায় বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের কর্তব্য নিয়ে 'থিসিস' পেশ করেন যেটি 'এপ্রিল থিসিস' নামে পরিচিত সেখানেও তিনি ক্ষমতা প্রদানের ক্ষেত্রে

[25] মজুমদার,সুবীর(সম্পাদিত)ঃ ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন, সংক্ষিপ্ত জীবনীঃ প্রগতি প্রকাশন, মস্কো বাংলা অনুবাদ-পৃঃ-১০১

[26] মজুমদার,সুবীর(সম্পাদিত)ঃ ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন, সংক্ষিপ্ত জীবনীঃ প্রগতি প্রকাশন, মস্কো বাংলা অনুবাদ-পৃঃ-১৪৬-১৪৭

শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর কথা বলেছেন। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব যে এগিয়ে এসেছে এটা লেলিন পরিষ্কার দেখতে পেয়েছিলেন, পার্টিকে প্রস্তুত করে তুলেছিলেন তার জন্য, কংগ্রেসের পর পার্টির কল কারখানার ফৌজে, গ্রামাঞ্চলে শ্রমিক, সৈনিক, নাবিক ও কৃষকদের মধ্যে বিরাট ব্যাখ্যামূলক ও সংগঠনমূলক কাজ চলে লেলিনের পরিচালনায়। গড়ে তুলেছিলেন 'লাল রক্ষীবাহিনী'(অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সময় প্রলেতারিয়েতের সশস্ত্র বাহিনী) তাদের প্রস্তুত করলেন যুদ্ধের জন্য, অবিরাম জনগণের গভীরে থাকায় লক্ষ লক্ষ শ্রমিক, কৃষক ও একটি একক বিপ্লবী ফৌজে সংহত করতে সক্ষম হল, এবং 'অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব' সারা বিশ্বের জনগণকে দেখিয়েছিল বিপ্লবী মার্ক্সবাদী পার্টির পরিচালনায় থাকলে শ্রমিক শ্রেণী ও গরিব কৃষকেরা কি অসীম শক্তিশালী।

মাও সে তুং এর মতে শ্রেণিসংগ্রামে কৃষক সম্প্রদায় -

ঠিক একই ভাবে চীনের সমাজতন্ত্রের নেতা মাও ও কৃষক শ্রেণীর উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। মাও এর নেতৃত্বে চিনে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা চীনের ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা করে। মাও সে তুং মার্কসবাদ লেলিনবাদ দ্বারা প্রভাবিত হলেও চীনের সনাতন ঐতিহ্যের সংযোগ সাধনের মাধ্যমে তিনি চীনে জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটান। চীনের সমাজ সংস্কৃতি ও পরিবেশের আলোকে মার্কসবাদ ও লেনিনের নির্দেশিত প্রক্রিয়ার কিছুটা পরিবর্তন সাধন করেন এবং কয়েকটি মৌলিক তত্ত্ব উদ্ভাবন করেন। চীনের সমাজতান্ত্রিক ইতিহাসে এবং মাওবাদ লেনিনবাদে মাও সে তুং এর তাত্ত্বিক সংযোজন গুলি 'মাওবাদ' নামে পরিচিত। ১৯৩৫ সালে মাও সে তুং কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব গ্রহণ করে পার্টিকে জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্য করে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন। পার্টি গ্রাম অঞ্চলে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে কৃষক, ব্যবসায়ী সকলকে ঐক্যবদ্ধ করেন। মাওয়ের যোগ্য নেতৃত্বে চীনে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সার্থকতা এসেছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। ১৯৪০ সালে মাও এর বিখ্যাত 'On new Democracy'- গ্রন্থে বিপ্লবের প্রকৃতি, লক্ষ্য, তাৎপর্য প্রভৃতি ব্যাখ্যা করেছেন। মাও গ্রামাঞ্চলের গরীব কৃষকদের সংগঠিত করে জাপানি ও কৃত্তমিনাটাং বাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলা কৌশলে লড়াইয়ের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে এক শক্তিশালী সৈন্যদল

গঠন করেন, প্রধানত এই সশস্ত্র কৃষক বাহিনীকে নেতৃত্ব দান করে মাও ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টি কুওমিনাটং এর সামাজিক ও সামরিক শক্তিকে সুদীর্ঘ সংগ্রামে পরাজিত করে ১৯৪৯ সালে সমগ্র চীন দখল করে।[27]

কৃষি প্রধান চীন দেশে কোটি কোটি কৃষকদের দলে টানতে পারা এক নতুন যুগের উপযোগী 'নতুন গণতন্ত্রের আদর্শ'[28] প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যেখানে তিনি বলেছেন নতুন ধরনের এই গণতান্ত্রিক বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির পরিচালনায় শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে কৃষক, পেটি বুর্জোয়া সকলেই অংশগ্রহণ করে একটি নতুন আদর্শ সৃষ্টি করবে'। মার্কস যেখানে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে সর্বহারাদের একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন, সেখানে মাও চিনের নয়া গণতন্ত্রে জনগণের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। শ্রমিককৃষক-, শহুরে পেটি বুর্জোয়া এবং জাতীয় বুর্জোয়াদের সমন্বয়ে জনগণতান্ত্রিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত করার কথা বলেছেন। চিনে লাল ফৌজ এর প্রতিষ্ঠাতা মাও, তার অন্যতম সাফল্য এই বাহিনীর মধ্যে গ্রামাঞ্চলে গরীব কৃষকদের সংগঠিত করে যুগোপযোগী ভাবে গড়ে তোলে এবং গেরিলা কৌশলে লড়াইয়ের মাধ্যমে এই বাহিনীকে শক্তিশালী করে এবং চীনে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে এবং পরবর্তীকালে এই 'লাল ফৌজ' এর নামকরণ হয় 'গণমুক্তি ফৌজ'।

মাও কৃষক শ্রেণীর উপর গুরুত্ব প্রদান করেন, তার দুটি কারণ হল- প্রথমতঃ চিন হল কৃষি প্রধান দেশ যেখানে কৃষক সম্প্রদায়েরই তিনি বিভিন্ন উপ ভাগকে স্বচক্ষে দেখেছেন ও নিজেও তা তুলে ধরেছেন- মালিক কৃষক (পেটিবুর্জোয়া), আধা মালিক কৃষক (বিপুল সংখ্যাধিক্য), গরিব কৃষক। আর দ্বিতীয়তঃ হলো তিনি নিজে হুনানের কৃষক আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন এবং উপলব্ধি করেছিলেন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে গেলে শুধু শ্রমিক শ্রেণী নয় তার মুখ শ্রেণী চীনের ক্ষেত্রে কৃষক শ্রেণীই। কেননা হুনান প্রদেশের মধ্য ও দক্ষিণ ভাগের কৃষকরা মাত্র চার মাসের

[27]মাও সে তুং ঃ নির্বাচিত রচনাবলীঃ ২য় খণ্ড ঃ চীন বিপ্লব ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টি, ২য় অধ্যায়,৪থ অংশ দ্রষ্টব্য।

[28] মাও সে তুং ঃ নির্বাচিত রচনাবলীঃ ২য় খণ্ড ঃ চীন বিপ্লব ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টি, ২য় অধ্যায়,৪থ অংশ দ্রষ্টব্য।

মধ্যেই বিপুল জনসমর্থনের মধ্য দিয়ে কৃষক আন্দোলন সংগঠিত করে ও তা সম্পন্ন করে এবং কৃষক সমিতির হাতে ক্ষমতা অর্পণের স্লোগান বাস্তবায়িত হয়।[29]

ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রেণিসংগ্রামে কৃষক সম্প্রদায় ও বাম দলগুলির বিকল্প নীতি গ্রহণ -

চীনের মতো ভারতবর্ষও একটি কৃষিনির্ভর রাষ্ট্র, স্বভাবতই ভারতেও চীনের মতো কৃষক সম্প্রদায়ের অবস্থানও বিপুল। পাশাপাশি দুটি দেশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রটি কে দেখলে দেখা যাবে ভারতবর্ষ ১৯৪৭ সালে যেমন স্বাধীনতা পেয়েছেঠিক তেমনি , চীন ১৯৪৯ সালে স্বাধীন হচ্ছে, স্বাধীনতার পরে চীনে কৃষক গোষ্ঠীকে একত্রিত করে এক নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব গড়ে তুলতে পারলেও ভারতবর্ষ কিন্তু কৃষক শ্রেণীকে সামনে রেখে কোন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত করতে পারেনি বা গণতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত করতে পারে নি, যদিও ভারতবর্ষে ১৯২০-র দশক থেকেই কমিউনিস্ট পার্টির উদ্ভব পরিলক্ষিত হয়।[30] এবং পরবর্তী দর্শক গুলিতে কমিউনিস্ট পার্টির কার্যাবলী আলোচনা করলে দেখা যায় যে তারা কোন রকম গণঅভ্যুত্থানের দিকে না গিয়ে তারা ভারতের সংসদীয় ব্যবস্থা অর্থাৎ ডেমোক্রেটিক পার্লামেন্টরি সিস্টেমের দিকে অগ্রসর হয়েছিল, আর এখানেই প্রশ্ন ওঠে যে কেন তারা গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত না করে সংসদীয় গণতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হল? যেখানে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র চীনে কমিউনিস্ট পার্টি গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ক্ষমতা দখলের করেছিল। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ব্যতিক্রমী হওয়ার কারণ জানতে গেলে একটু গভীরে বিশ্লেষণ করতে হবে।[31] চীন ও রাশিয়ার দুটি বিপ্লবই সফল হয়েছিল ব্যক্তিসম্পত্তিভিত্তিক শ্রেণী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের দুর্বলতাকে ঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারার জন্য। প্রতিষ্ঠানগুলি কি অবস্থায় আছে, সাধারণ মানুষের কাছে এগুলোর মান্যতা কতটা রক্ষিত হচ্ছে, বিপ্লবীদের বিচারে আনতে হয়েছিল এই বিষয়টাকে। বিপ্লবের কেন্দ্রীয় প্রশ্ন যেহেতু রাষ্ট্রক্ষমতা দখল, রাষ্ট্র কিভাবে

[29] মাও সে তুং ঃ নির্বাচিত রচনাবলীঃ ২য় খণ্ড ঃ চীন বিপ্লব ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টি, পৃঃ-৩২

[30] হিতেশরঞ্জন সান্যাল, স্বরাজের পথে, কলকাতা, ১৯৯৪।

[31] ভারতের মাওবাদী রাজনিতিঃ দেশকাল ভাবনায় প্রকাশিত প্রবন্ধ সংকলন(২০০৯-১১) ঃ নিমাই করণ।

টিকে আছে, কোন জায়গায় তার মান্যতা আছে, কি করলে এই মান্যতা কমানো যাবে সেটা বিচার করতে হবে সবার আগে। আর সেটাই হবে 'ক্রান্তিকাল'[32], যখন একটি বিদ্যমান রাষ্ট্রব্যবস্থা নিজের মান্যতা ধরে রাখতে পারছে না। বিত্তবান শ্রেণীরা এই 'ক্রান্তিকালে' প্রাণপণে চেষ্টা করে নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে, 'যৌথ স্বার্থে'র[33] ধুয়া তুলে আবার সেই মান্যতা ফিরিয়ে আনতে। কমিউনিস্টদের বুঝতে হবে এই ক্যাম্পেনের দুর্বলতা কোথায়। মার্কসবাদের মূল শিক্ষাকে দেশের বিদ্যমান বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে সৃজনশীলভাবে প্রয়োগ করে এই মান্যতা আনার প্রকল্পকে বানচাল করার পন্থা অনুসন্ধান করতে হবে তাদেরকে। এই কাজে সফল হলেই গড়া যাবে শ্রেণীভিত্তিক পাল্টা রাষ্ট্র জনসমর্থন অবশ্যই থাকবে এই পাল্টা রাষ্ট্রের পক্ষে এবং জনগণই এগিয়ে এসে কমিউনিস্ট নেতৃত্বে ভেঙে দেবেন বিত্তভিত্তিক সমাজের মান্যতা ফিরিয়ে আনার প্রতিক্রিয়াশীল প্রকল্প। রাশিয়াতে এই কাজটা করা হয়েছিল বুর্জোয়া রাষ্ট্র গড়ার প্রকল্পে সমাজতান্ত্রিক উপাদান নিয়ে এসে জারহীন বুর্জোয়া রাষ্ট্রকে সংহত হতে না দিয়ে। আর চিনে এটা করা হয়েছিল আধুনিক রাষ্ট্র গড়ার প্রকল্পটিকেই কমিউনিস্ট এজেন্ডায় নিয়ে এসে।[34] অর্থাৎ রাশিয়ায় আধুনিক রাষ্ট্র গড়ে ওঠার প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হওয়ার আগেই সেখানে কমিউনিস্ট পার্টির আবির্ভাব হয়েছিল এবং কমিউনিস্ট পার্টি সাফল্যের সাথে বুর্জোয়া রাষ্ট্র বা আধুনিক রাষ্ট্রের এই ন্যায্যতা নির্মাণের প্রকল্পটিকে বানচাল করে দিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্র নির্মাণ করার প্রকল্পটি সম্পূর্ণ করেছিল। পরিস্থিতিতে সে সুযোগ ছিল এবং বলশেভিকরা পূর্ণ মাত্রায় এই সুযোগ গ্রহণ করেছিল। চীনের ক্ষেত্রে বিষয়টা ছিল কমিউনিস্টদের আরও অনুকূলে। সেখানে আধুনিক রাষ্ট্র নির্মাণের জন্য জাতীয় বুর্জোয়াকেই অভ্যুত্থান সংগঠিত করতে হয়েছিল এবং তার পরের পরিস্থিতি চলে গিয়েছিল সম্পূর্ণভাবে কৃষক যুদ্ধের পক্ষে এবং সে যুদ্ধে নেতৃত্ব দিতে পারার মত শুধুমাত্র কমিউনিস্টরাই ছিল। যুদ্ধে কমিউনিস্টরা যে জিতে গিয়েছিল তার কারণ, বিপুল কৃষক জনতার সমর্থন ছাড়াও পার্টি অনুসৃত সঠিক যুদ্ধনীতি- দেশের অসম বিকাশের প্রেক্ষিতে যার একমাত্র রূপ হতে পারতো জনযুদ্ধ এবং যার মূল কৌশল হতে পারতো গেরিলা যুদ্ধ। পাল্টা রাষ্ট্র গড়ার ক্ষেত্রেও দুই বিপ্লবের ভিন্নতা

[32] খাসনবিশ, রতন ; রাষ্ট্র, সমাজ ও বিপ্লব(প্রবন্ধ)।

[33] খাসনবিশ, রতন ; রাষ্ট্র, সমাজ ও বিপ্লব(প্রবন্ধ) ; পৃঃ-৭৭।

[34] খাসনবিশ, রতন ; রাষ্ট্র, সমাজ ও বিপ্লব(প্রবন্ধ) ; পৃঃ-৭৮।

ছিলো। রাশিয়ায় কমিউনিস্টরা জিতেছিল ঠিক সময়ে অভ্যুত্থান ঘটিয়ে কেরেনেস্কির বুর্জোয়া সরকারকে ক্ষমতা সংহত করতে না দিয়ে, আর চিনে কমিউনিস্টরা জিতেছিল শহরে সংহত চিয়াংয়ের (এবং উত্তরের যুদ্ধবাজদের) রাষ্ট্রকে পাশ কাটিয়ে পাল্টা রাষ্ট্র গড়ে, যা কোনোমতেই চিয়াং বা অন্য যুদ্ধবাজদের রাষ্ট্রগুলিকে ন্যায্যতা আনতে দিচ্ছিল না।[35]

বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রথম পর্বের শোধনবাদীরা পরে যাদের 'সোশ্যাল ডেমোক্রাট' নামকরণ করা হয়েছিল, তারা বিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্বেই দেশে দেশে সরকারী ক্ষমতার অংশীদার হয়ে পড়েছিল এই শান্তিপূর্ণ উত্তরণের তত্ত্ব সামনে রেখে। প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে সেই তত্ত্ব 'কমিউনিস্ট পার্টি' নামধারীদের মধ্যেও আধিপত্য কায়েম করে ফেলতে সমর্থ হল। আশ্চর্যজনকভাবে এই বিজয় সম্ভব হল ক্রুশ্চেভের চূড়ান্ত ধরনের স্ববিরোধী ও হাস্যকর যুক্তিধারায়। যখন তিনি পারমাণবিক বোমার ভয় দেখিয়ে 'শ্রেণী'কে নিরস্ত্র হওয়ার কর্মসুচী দিচ্ছেন তখনই তিনি বলছেন এই নিরস্ত্র জনগনকে রোখার ক্ষমতা পারমাণবিক বোমার অধিকারী পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির নেই। কারণ এটা 'সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের যুগ।' অতএব অস্ত্র ছাড়াই শ্রমিকশ্রেণীর জয় সুনিশ্চিত।

এই ছেলেভুলানো কথার আড়ালে তিনি যে আন্তজার্তিকভাবেই শ্রমিকশ্রেণীকে ধনতন্ত্রের অগ্রগতির প্রতি চ্যালেঞ্জ জানানোর থেকে নিরস্ত্র করতে চাইছিলেন ১৯৫৭ পরবর্তী বিশ্ব কমিউনিষ্ট আন্দোলনের ইতিহাস তা স্পষ্ট করে দিয়েছে। ভারতবর্ষে CPI খোলাখুলি ক্রুশ্চেভের অবস্থানের দিকে চলে গেল। ১৯৬১-তে কংগ্রেসের পর থেকেই বিজয়ওয়াদার কার্যতঃ পার্টি দু'টুকরো হয়ে যায়। কিন্তু বিস্ময়কর এটাই যে নবগঠিত পার্টি CPI(M)ও প্রথম থেকেই ক্রুশ্চেভ বর্ণিত পথে চলতে শুরু করল, যদিও ঘোষিতভাবে তারা ক্রুশ্চেভ কথিত 'শান্তিপূর্ণ পথের' সমর্থক ছিলেন না। আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলন এই চরম বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে যাওয়ার সবচেয়ে বড় প্রমাণ পাওয়া গেল দেশে দেশে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে চরম নিষ্ক্রিয়তা ও আপোষকামী প্রবণতা বৃদ্ধির মধ্যে। একে এককথায় শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সরাসরি বুর্জোয়া মতাদর্শের নতুন বিজয়লাভ বলা চলে। '৭০ ও '৮০র দশকে ভারতবর্ষ সহ দেশে দেশে 'কমিউনিষ্ট পার্টি' গুলোর মধ্যে দেখা দিল শ্রমিক শ্রেণীর উদ্যোগ, সক্রিয়তা, সমর্থন-বর্জিত ভাবেই ক্ষমতা দখল করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। পুরনো পার্টিগুলোর মধ্যে এই ঝোঁক ক্ষমতালোভী হিসেবে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের অনেক সেরা

[35] খাসনবিশ, রতন ; রাষ্ট্র, সমাজ ও বিপ্লব(প্রবন্ধ) ; পৃঃ-৭৮।

সম্ভাবনাকে ভেতর থেকে পচিয়ে দিল। শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতাদখলের উদ্যোগ বা চাহিদা না থাকলে কমিউনিষ্টদের যে সেখানে ক্ষমতার ধারে কাছে থাকার কথা নয় এই সহজ সত্যটা খুব সুন্দরভাবে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হল। ক্ষমতার বৃত্তের মধ্যে থেকে যাওয়ার জন্য শুরু হল বুর্জোয়াদের সাথে দরকষাকষি। তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলোতে প্রায় সর্বত্রই তাই বিভিন্ন ধরণের কমিউনিষ্ট নামধারীঁ পার্টিসংগঠন দেখতে পাওয়া যাবে যারা সংসদীয় রাজনীতিতে একটা ন্যূনতম ক্ষমতার অংশীদারিত্ব পেতে পারছে বুর্জোয়াদের কাছে শ্রমিকশ্রেণীকে সংগঠিত ভাবে আত্মসমর্পণ করানোর প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে। যারা এখনও ক্ষমতার ভাগ পায়নি, তারাও 'পার্টি' কর্মসূচীতে 'সুযোগ এলেই সরকারে যোগদানে'র সিদ্ধান্তকে স্বাভাবিক বিষয় হিসেবে বর্ণনা করে রেখেছেন। অথচ এসব দেশগুলির কোথাওই সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির নতুন নতুন অত্যাচারকে চ্যালেঞ্জ জানানোর মত ন্যূনতম উদ্যোগ শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে দেখা যাচ্ছে না। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠবে তাহলে এই পার্টিগুলির শ্রেণীভিত্তি কি? এর জবাব খুব স্পষ্ট। হয় এগুলি শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বুর্জোয়া মতাদর্শের প্রতিনিধি, সে অর্থে বুর্জোয়া-পেটি বুর্জোয়া পার্টি। নয় এগুলি সরাসরি 'কৃষক পার্টি'। এগুলি বর্তমান তৃতীয় দুনিয়ার শোধনবাদের প্রধান প্রতিনিধি।

'কমিউনিষ্ট পার্টি' নামধারী সংগঠনগুলির মধ্যে 'সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের' ধারায় 'পার্লামেন্টারিজম'-এর জয়লাভ, বুর্জোয়াদের সঙ্গে কমিউনিষ্ট পার্টির বন্ধনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার পর এবার কর্মসুচীতে 'শ্রেণী একনায়কত্ব' বিষয়ে সংশোধন আনা হচ্ছে। শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বের স্লোগান সমাজে যে কোনো ধারার সংগঠিত শ্রমিক শক্তির মধ্যে যে আত্মমর্যাদা ও সাহসের সঞ্চার করে তা আধুনিকতম পুঁজিবাদের বাজার-পুনর্গঠনের রণকৌশলের বিরোধী। তাই 'মার্কসবাদী' নামধারী শিবিরের মধ্যেই পুঁজিপতিদের 'শ্রেষ্ঠ সন্তানদের' দায়িত্ব পড়েছে 'শ্রেণী'র সংগঠিত শক্তির প্রকাশ যে কোনো ধরণের স্লোগানকে মুছে দেওয়ার। কমিউনিষ্ট পার্টি কর্তৃক শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বের সফল অনুশীলনের অনুপস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে, তার ভ্রান্ত অনুশীলন থেকে উদ্ভুত কর্তৃত্ববাদ ও আমলাতন্ত্রকে অজুহাত করে এমন একটা ভঙ্গিতে একনায়কত্বের ধারণার বিরোধিতা উপস্থিত হয়েছে যেন 'একনায়কত্ব' ধারণাটাকে কমিউনিষ্টরা দু-একটা লোকের কর্তৃত্ব বা জনসাধারণের ওপর একটা গোষ্ঠীর একচ্ছত্র আধিপত্য বোঝাতে হাজির করেছিল। অতএব 'একনায়কত্ব নয়', 'গণতন্ত্র' চাই। এর বিপরীতে কমিউনিষ্টদের মৌলিক অবস্থান ছিল এই— আমরা বুর্জোয়াদের 'শোষণ করার' গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে, 'সমাজকে মুনাফাকেন্দ্রিক করে তোলার' গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে সমাজের প্রতিটি মানুষকে 'বাণিজ্যিক সম্পর্কের ভিত্তিতে সম্পর্কিত করার' গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে। আর তাহলে বুর্জোয়াদের বুর্জোয়া হিসেবে কোন গণতন্ত্র থাকবে না।

বুর্জোয়াদের কাছ থেকে বুর্জোয়া হিসেবে তাদের এইসব ‘গণতান্ত্রিক অধিকার’ কেড়ে নেওয়া হবে কীভাবে। এর উত্তরে বলা হয়েছিল সমাজের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ যখন শ্রম ‘বিক্রি করাকেই’ জীবন ধারণের একমাত্র উপায় হিসাবে বেছে নেবে তখন কৃষি, মানসিক শ্রমদান সহ সমাজের বিভিন্ন পেশার মানুষের অবস্থান হয়ে দাঁড়াবে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থান। তাদের স্বার্থ হয়ে দাঁড়াবে অভিন্ন একটি একক— বুর্জোয়াদের ঐসব ‘গণতান্ত্রিক অধিকার’ গুলিকে কেড়ে নেওয়া। তা না হলে মানব সভ্যতার সামনের দিকে এগোনোর আর কোনো উপায় নেই। উৎপাদনের অবাধ বিকাশের জন্য, বেকারীত্ব-অনাহার-অর্ধাহার-অশিক্ষা-বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর কলঙ্ক থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য ‘গণতন্ত্রে’র আড়ালে ‘বুর্জোয়া গণতন্ত্রে’র কোনো রাস্তা নেই। তাই সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের পক্ষে সংখ্যালঘু বুর্জোয়াদের ‘গণতন্ত্র’কে হরণ করাই হল সভ্যতার অগ্রগতির একমাত্র পথ। আর সমাজে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের রাজনৈতিক আধিপত্য প্রকাশের রাজনৈতিক পরিভাষা হল ‘শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব’।

একইভাবে যদি ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটটি আলোচনা করা হয় তাহলে প্রথমেই এটা মেনে নিতে হবে যে ব্রিটিশ শাসকরা এক ধরনের সামাজিক ন্যায্যতা আদায় করেই ভারতবর্ষকে শাসন করেছে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত (অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট সমাজ গোষ্ঠী ইংরেজদের কে সমর্থন করেছে)। এই ন্যায্যতা আদায় করার জন্য ইংরেজরা প্রয়োগ করতো ‘আইনের শাসন’।[36] ব্রিটিশ এদেশে আনে আধুনিক আইন, যাতে বলা হয় রাষ্ট্রের কাছে আইনত সকলেই সমান। সমতার বিষয়টিও সতর্ক ভাবে কাজে লাগানো হতো। ফৌজদারী আইনে সমতা থাকলেও সম্পত্তি আইনে তা ধর্মীয় তফাৎ রক্ষা করতো এবং আইনের শাসন থাকলেও ধর্মীয় ও দেশাচারের বিষয়ে শাসকরা খুব কম হস্তক্ষেপ করতো (যদিও রাজনৈতিক স্বার্থে এগুলো ব্যবহার করতে ইতঃস্তত করত না ইংরেজ শাসকরা)। একই সঙ্গে দেশটির মধ্যে যে বহু জাতিসত্ত্বার অস্তিত্ব আছে, শাসন কাঠামো গড়তে ইংরেজরা সেটা খেয়াল আনতো। রাজন্যবর্গ শাসিত অঞ্চলেও ইংরেজরা আইনের শাসন আছে কিনা, সেটা নজরে রাখত। ব্রিটিশ শাসকরা এদেশে সবশেষে যে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন চালু করে সেটা এত বেশি মজবুত, যে আধুনিক ভারতেও সেটাই শাসন কাঠামোর ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছিল। কিন্তু ইংরেজ শাসক ছিল বিদেশী শাসন এবং কালক্রমে, এদেশে

[36] ভারতের মাওবাদী রাজনিতিঃ দেশকাল ভাবনায় প্রকাশিত প্রবন্ধ সংকলন(২০০৯-১১) ঃ নিমাই করণ।

জাতীয়তাবাদী আকাঙ্ক্ষা যত বিস্তৃত হতে থাকে দেশটিতে ব্রিটিশ শাসন তার ন্যায্যতা হারাতে থাকে। এই অবস্থায় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রাম গড়ে ওঠার একটা সম্ভাবনা ছিল। এই সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হয়নি। বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণ কৃষক প্রশ্নটি পাশ কাটিয়ে গেছে এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম।[37] দেশের মূল জনসংখ্যা ছিল কৃষক এবং ভূস্বামী বিরোধী লড়াই বাদ দিয়ে, এই কৃষক জনতাকে স্বাধীনতা সংগ্রামে যুক্ত করা সম্ভব ছিল না। দেশের যে দুটি দল স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিল তাদের কোনটিই কৃষক সংগ্রাম গড়তে রাজি ছিলো না। অসহযোগ বা সত্যাগ্রহের পর্যায়ে কংগ্রেসে আন্দোলন যত গণ চরিত্র অর্জন করে, দলটির নিচতলায় ততই কৃষকের দাবিকে কেন্দ্র করে লড়াই করার প্রবণতা দেখা দেয় বটে, কিন্তু কংগ্রেসের উদ্বোধন নেতৃত্ব কখনোই এ লড়াই চালিয়ে যেতে রাজি হতো না। দরকার মতো কৃষক আন্দোলনের[38] সংগঠক অবাধ্য নিচুতলার কর্মীদের বহিষ্কার পর্যন্ত করে দিতো এই দলটি। আর মুসলিম লীগ ধর্মীয় দাঙ্গা বাঁধানো ছাড়া কোন গণ কার্যকলাপ করার কথা কখনও ভাবে নি- কৃষক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া তো দূরের কথা। দুটি প্রধান দলের এই ব্যর্থতার দরুণ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াই এদেশে চীনের মতো কৃষক যুদ্ধের চেহারা নিয়ে হাজির হয়নি। এই অবস্থায় কমিউনিস্টদের কাছে অবশ্যই একটা বড় সুযোগ ছিল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামকে সামন্তবাদ বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত করার। কমিউনিস্টরা এই সুযোগ কাজে লাগায় নি। লাগায় নি, তার কারণ এদেশে কৃষি প্রশ্নের গুরুত্ব তারা উপলব্ধি করতে পারে নি। শ্রমিক শ্রেণীর পর্যাপ্ত বিকাশ না হওয়া এবং উপনিবেশ- আধা-উপনিবেশে কৃষকদের যে বৈপ্লবিক ভূমিকা থাকে স্বাধীনতা যুদ্ধে সেটি অবহেলিত থাকার কারণে স্বাধীনতার সংগ্রাম এদেশে ক্ষমতা হস্তান্তরের সংগ্রামে পরিণত হয়। নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রাম, দর কষাকষি এবং তার মধ্যে দিয়ে ব্রিটিশের তৈরি করা শাসন কাঠামোর ভারতীয়করণ- মোটামুটি বিকশিত হয় এ দেশের উপনিবেশ মোচনের সংগ্রাম। এর ফলে ব্রিটিশ শাসন তেমন কোন সংকটে পড়েনি। ১৯৪৬-৪৭ সালের সময়সীমায় অতি অল্প সময়ের জন্যই এ দেশে একমাত্র

[37] খাসনবিশ, রতন ; রাষ্ট্র, সমাজ ও বিপ্লব(প্রবন্ধ) ; পৃঃ-৭৯।

[38] অমল হালদার; বর্তমান পরিস্থিতি ও কৃষক আন্দোলনের কয়েকটি বিষয়।

শাসনতান্ত্রিক সংকট দেখা দিয়েছিলো[39]- যখন ব্রিটিশ শাসন কোন ন্যায়তাই রক্ষা করতে পারছিল না এবং এদেশে বিপুল গণ আন্দোলন দেখা দিয়েছিলো। কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ এর সাহায্যে ব্রিটিশ শাসকরা এই সংকট কাটিয়ে তুলল এবং ব্রিটিশের তৈরি করা রাষ্ট্রকাঠামো অক্ষুণ্ণ রেখে এদেশে ক্ষমতা হস্তান্তর করার কাজটা করে ফেলল। ক্ষমতা হস্তান্তরের পর এই উপমহাদেশে যে দুটি রাষ্ট্র গড়ে উঠলো, সেই দুটি রাষ্ট্রই পেল ব্রিটিশের তৈরি করা মজবুত আমলাবাহিনী, পেল সুশৃংখল সেনাবাহিনী, ব্রিটিশদের বিচার ব্যবস্থা, এবং আইনের শাসন। পাকিস্তান কিছুটা গোলমেলে পড়লেও ভারত রাষ্ট্রটি একই সঙ্গে পেল একটি সংসদীয় গণতন্ত্র, যেখানে সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে চলে দলীয় শাসন। ভারতবর্ষের এই সংসদীয় গণতান্ত্রিক দলীয় ব্যবস্থাকে পরিচালনা করার জন্যই রয়েছে একটি বিশাল সংবিধান। এই সংবিধান রচনার কাজ করেছিল গণপরিষদ। চার্লস বেটেলহাইম দেখিয়েছেন চার ধরনের সদস্যদের প্রাধান্য ছিল গণপরিষদে। এরা হলেন- ১) ভূস্বামী ও রাজন্যবর্গ, ২) উচ্চবর্গের প্রফেশনালস, ৩) বড় বুর্জোয়া এবং ৪) পুনরুত্থানবাদী চিন্তাপুষ্ট হিন্দুবলয়ের একদল কংগ্রেসি।[40] ৮২ শতাংশ সদস্যরা ছিলেন কংগ্রেস দলভুক্ত। গণপরিষদ সদস্যদের শ্রেণীগত অবস্থান ও জাতীয় পরিচিতি নিয়ে একটি বস্তুনিষ্ট বিশ্লেষণ করেছেন ঘনশ্যাম শাহ।[41] তিনি দেখিয়েছেন -৮২ শতাংশ নির্বাচিন হয়েছিল প্রাদেশিক বিধানসভার সদস্যদের দ্বারা অথবা তাঁরা ছিলেন রাজাদের প্রতিনিধি। বিধানসভার সদস্যরা নির্বাচিত হয়েছিলেন ২৮.৫ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে। ভোটদাতারা ছিলেন হয় করদাতা, নয় সম্পত্তির মালিক, নয় গ্রাজুয়েট। অসংখ্য কৃষক, শ্রমিক, তপশিলি জাতি ও উপজাতি ভুক্ত মানুষেরা ছিলেন নির্বাচন প্রক্রিয়ার বাইরে। হিন্দুরা ছিলেন মোট সদস্যের ৮৩ শতাংশ। এদের মধ্যে ৪৫ শতাংশ ছিলেন জমিদার, ধনী চাষী অথবা প্রাক্তন সরকারি কর্মচারী। ৩৫ শতাংশ কায়স্থ। এদের সিংহভাগ ছিলেন ডাক্তার, উকিল, জমিদার। ১০ শতাংশ এসেছিলেন মারোয়ারি ও বেনিয়া সম্প্রদায় থেকে, ৬ শতাংশ জমির

[39] খাসনবিশ, রতন ; রাষ্ট্র, সমাজ ও বিপ্লব(প্রবন্ধ) ; পৃঃ-৮০।

[40] চার্লস বেটেলহাইম, ইন্ডিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্ট,লন্ডন, ১৯৬৮, পৃ. ১০৬

[41] ঘনশ্যাম শাহ, 'কাস্ট, ক্লাস অ্যান্ড দ্য ষ্টেট', সেমিনার, মার্চ ১৯৯০, পৃ. ৩১-৩২

মালিক রাজপুত সম্প্রদায় থেকে।[42] স্পষ্টতই গণপরিষদের সদস্যরা এসেছিলেন দুটো বিশেষ শ্রেণী থেকে। তারা যে সংবিধান তৈরি করেছেন তা প্রধানত তাদের স্বার্থবাহী হবে সেটাই স্বাভাবিক।

এর ফলে এ রাষ্ট্রকেন্দ্রিক যে মতাদর্শ জোরদার হয়ে উঠেছিল ভারতবর্ষে তা হলো রুশো ও হেগেলের মতাদর্শ- 'যৌথ স্বার্থে'র মতাদর্শ।[43] এই মতাদর্শের মান্যতার উপর দাঁড়িয়েই ভূস্বামী ও বুর্জোয়ারা ভারতবর্ষকে শাসন করার দিকে এগিয়ে ছিল। ফলে চিন বা রাশিয়ায় যে 'শাসনতান্ত্রিক সংকট' কমিউনিস্টদের সামনে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের সুযোগ এনে দিয়েছিল, ভারতে সে ধরনের 'শাসনতান্ত্রিক সংকট' আসার সম্ভাবনা তৈরি হয় নি। এটা হল বাস্তব যে তৃণমূল স্তর পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র কম বেশি মান্যতা পেয়েছিল সারা ভারতবর্ষ জুড়ে। রাষ্ট্র দেখে যৌথ স্বার্থ,এই ধারণা , এদেশে এতই প্রবল যে শ্রেণী দ্বন্দ্বের বিষয়গুলি পর্যন্ত এদেশে রাষ্ট্রের কাছেসওয়াল দরবারের বিষয় হয়ে পড়ে এবং আইন সংশোধন মারফত সেগুলি মোকাবিলার চেষ্টা চলে।

এটা ঠিক যে বিশাল এই দেশের সর্বত্র সমান ভাবে রাষ্ট্র নামক প্রতিষ্ঠানটি পৌঁছায় না। বহু এলাকা মুক্তাঞ্চল হয়ে পড়ে, বহু এলাকায় বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিশালী হয়ে ওঠে নানা সময়ে। যেটা খেয়াল করতে হবে, সেটা হল, ভারত রাষ্ট্র প্রাজ্ঞতার সঙ্গে সে সব অঞ্চলে 'বিশেষ প্যাকেজ' ঘুষ দিয়ে ক্ষোভের এর উদ্গাতাদের প্রাতিষ্ঠানিক নিগড়ে বেঁধে ফেলে অসামান্য দক্ষতায়। এক দিনে তা হয় না, সর্বত্র তা কাজে দেয় না। তবে এভাবেই 'যৌথ রাষ্ট্রে'র মতাদর্শ ছড়িয়ে দেশটির 'শাসনতান্ত্রিক সংকট' কাটায় ভারতরাষ্ট্র।

এমত অবস্থায় বাস্তবের দিকে তাকিয়ে শ্রমিক শ্রেণীর বা শ্রমের গ্র্যান্ড ন্যারেটিভের উপর যারা আস্থা রাখেন তাদের পক্ষে এই কঠিন এবং তিক্ত সত্য এড়িয়ে গিয়ে কোনভাবেই এ দেশে পাল্টা রাষ্ট্র গড়ার সংগ্রামে সাফল্য অর্জন করা সম্ভব নয়। যে দেশে নানা ঐতিহাসিক কারণে তৃণমূল স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত রাষ্ট্র বিপুল গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে, সে দেশে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে এড়িয়ে গিয়ে সাধারণ মানুষকে সংগঠিত করা সম্ভব নয়। রাষ্ট্র নির্মিত প্রতিষ্ঠানগুলিতে অংশগ্রহণ

[42] ঘনশ্যাম শাহ, 'কাস্ট, ক্লাস অ্যান্ড দ্য ষ্টেট', সেমিনার, মার্চ ১৯৯০, পৃ. ৩১-৩২

[43] খাসনবিশ, রতন ; রাষ্ট্র, সমাজ ও বিপ্লব(প্রবন্ধ) ; পৃঃ-৮১।

করে, সেগুলি যে 'যৌথ স্বার্থ'র বদলে শ্রেণী স্বার্থ রক্ষারই হাতিয়ার- সেটা উদঘাটিত করতে হবে ধৈর্যের সাথে। সমাজের যেহেতু আছে বিপুল অসাম্য, বুর্জোয়া ভুস্বামী অর্থনীতি যেহেতু শ্রমজীবী মানুষকে ক্রমাগত আক্রমনের মুখোমুখি করে রাখে, মতাদর্শর লড়াইয়ে বামপন্থীদের জয় লাভ করা তাই বাস্তব কারণ আছে। এই বাস্তব পরিস্থিতি ও সম্ভাবনাকে সামনে রেখেই বামপন্থী রাজনীতি ভারতবর্ষে গণঅভ্যুত্থানের না গিয়ে সংসদীয় ব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হয়-। অর্থাৎ ব্রিটিশ সরকার সহজে যেমন ভারতীয় বুর্জোয়াদের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করে গেছে ফলে ভারতবর্ষে কোন 'শাসনতান্ত্রিক সংকট' পরিলক্ষিত হয়নি, যার ফলে সমাজতন্ত্র অনুযায়ী কোন 'ক্রান্তিকাল' গড়ে ওঠার সম্ভাবনা তৈরি হয়নি। তাই ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট পার্টি বিকল্প পথ অবলম্বন করার চেষ্টা করেছে আর এখানেই তৈরি হয়েছিল বিতর্ক- 'ভোট বয়কট নাকি ভোটে অংশগ্রহণ'। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে দুটি পরস্পরবিরোধী প্রবণতা গড়ে ওঠে। একটি 'পার্টি নেতৃত্বে নির্বাচন মুখী সংসদ সর্বোচ্চ রাজনীতি' আর একটি 'কমিউনিস্ট কর্মীবাহিনীর সংগ্রামী মুখী বিপ্লব কামি রাজনীতি'। একদিকে এস. এ ডাঙ্গের নেতৃত্বে কমিউনিস্টদের' দক্ষিণপন্থী' জাতীয় পরিষদ, এরা স্তালিন বিরোধী, ক্রুশ্চেভপন্থী, চীন-সোভিয়েত বিতর্কে তারা সোভিয়েতপন্থী, সর্বভারতীয় নেতৃত্বে অধিকাংশই ছিলেন এইদিকে। অন্যদিকে মোজাফফর আহমেদের নেতৃত্বে কমিউনিস্টদের 'বামপন্থী' অংশ। অর্থাৎ আদর্শগত মতপার্থক্যের দ্বিধাবিভক্ত হয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দুটি ভাগে ভাগ হয়ে যায়। একটি হয় সি পি আই আর অন্যটি হলো সিপিআইএম। সি পি আই বলে- 'জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করতে হবে তারপর জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব'। অন্যদিকে সিপিআইএম বলে- 'জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব এর ক্ষেত্র প্রস্তুত'। পরবর্তী সময়ে দেখা যায় যে এই মতপার্থক্য থাকলেও ভারতের সকল কমিউনিস্ট দলই তাদের বিকল্প নীতি তথা সংসদীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে এই ব্যবস্থার ও শাসক শ্রেণীর শ্রেণী চরিত্র তুলে ধরে নির্বাচনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে কৃষক শ্রেণির কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করে ও বিপ্লবের পথ প্রশস্থ করার চেষ্টা করে।

ভারতের ইতিহাস দেখলে দেখা যাবে যে ১৯২০ র আগে পর্যন্ত কংগ্রেস দলের প্রাধান্য ছিল একক।[44] কিন্তু ত্রিশের দশকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম হয় এবং ভারতের দুটি রাজ্য

[44] Vinita Damodaran, Broken promises: popular protest, Indian Nationalism and the congress party in bihar 1935-46,Delhi,1992.

বাংলা ও কেরলের এই কমিউনিস্ট প্রভাব বিস্তার করতে থাকে বিশেষতঃ বাংলায় জমিদার খাজনা ভোগীদের নিয়ে গড়ে ওঠার যে ভদ্রলোকেরা ছিল কংগ্রেস সংগঠনের মূল শক্তি তারা ক্রমশ অন্তর্মুখী হয়ে পড়ার জন্য ১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক আইন সভার নির্বাচনে কৃষক পার্টি বিরাট সাফল্যের মুখ দেখে।

ত্রিশের দশকের শেষের দিকে বাংলায় জমিদার, জোতদার, এবং ভাগ চাষীদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব, আর এই দ্বন্দ্বের আবর্ত থেকেই কমিউনিস্ট প্রভাবিত কৃষকসভার নেতৃত্বে গড়ে ওঠে তেভাগা আন্দোলন। ভূমি সংস্কার আইনের যথার্থ প্রয়োগ, খাদ্যের দাবি, উদ্বাস্তু পুনর্বাসন প্রভৃতি ক্ষেত্রে বামপন্থীদের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে বৃহত্তর আন্দোলন, যা বাংলার রাজনীতিতে বামপন্থী দলকে ক্ষমতা অর্জনের পর্যায়ে নিয়ে আসে। বাংলার গ্রাম অঞ্চলে কৃষকদের বাস্তব সমস্যা গুলি[45] (কৃষক প্রজা পার্টি ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে নিজেদের মেনিফেস্টোতে বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি উচ্ছেদ, খাজনা হ্রাস, নজর সেলামি রহিতকরণ, খাজনা ঋণ মকুব, সালিশী বোর্ড গঠন, নদী সংস্কার, বাংলার পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন প্রভৃতি দাবি লিপিবদ্ধ করে) এই নির্বাচনে কৃষক প্রজা পার্টি ৩৫ টি আসন পেয়েছিল।[46]

হিতেশ রঞ্জন সান্যাল[47] দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের গণ আন্দোলনের প্রসার আলোচনা করতে গিয়ে জমিদার শ্রেণীর পতন এবং ধনী ও সংগঠিত সম্পূর্ণ কৃষকের মধ্য থেকে সমগ্র দেশব্যাপী এক নতুন নেতৃত্বের উত্থান লক্ষ্য করেছেন। তার মতে এই নতুন নেতৃত্ব প্রভাবিত ছিল বামপন্থী মতাদর্শ দ্বারা। এই বক্তব্যের বর্ধিত বিশ্লেষণ পাওয়া যায় বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর গবেষণায়।[48] তার গবেষণার মূল কেন্দ্রবিন্দু হলো মেদিনীপুরের ভারত ছাড়ো আন্দোলন। তিনি দেখিয়েছেন যে মেদিনীপুরের এই আন্দোলনের মূল ছিল সেখানকার স্থানীয় ভূমি সম্পর্ক ও জাতি কাঠামো।

---

[45] বদরুদ্দিন উমর, চিরস্থায়ী বন্দবস্তে বাংলাদেশের কৃষক, কল্কাতা,১৩৮৪,পৃ.৩০

[46] Dilip Banerjee, Election Recorder-an Analytical Reference, Bengal/ West Bengal, 1862-2006, Kolkata,2006,p-40

[47] হিতেশরঞ্জন সান্যাল, স্বরাজের পথে, কলকাতা, ১৯৯৪।

[48] Bidyut Chakroborty, Local Politics and Indian Nationalism, Midnapur,1919-1944, Delhi, 1997.

১৯৫০-৬০ দশকে পশ্চিমবাংলার বামপন্থী রাজনীতি আধা-সামন্ততান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলে।[49] ১৯৬৬ সালের উত্তাল খাদ্য আন্দোলন এবং একই সালে নকশালবাড়িতে জোতদার কৃষকদের দ্বন্দ্ব শুরু হয়, যা ১৯৬৭ সালের মে মাসে নকশালবাড়ি আন্দোলন নামে পরিচালিত হয় এই আন্দোলনের উপর প্রভাব ছিল বামপন্থী দল সিপিআইএমের। নকশালবাড়ি আন্দোলন যেহেতু কৃষকদের আন্দোলন এবং তাতে বামপন্থীদের সমর্থন ছিল তাই গ্রামের কৃষকদের সাথে এই বামপন্থীদের একটি সু-সম্পর্ক তৈরি হয় যা পরবর্তীকালে নির্বাচনে বামপন্থী দলের অবস্থানকে সুনিশ্চিত করে।

কিন্তু ভারতবর্ষে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কাঠামো অবস্থান থাকায় রাজ্যগুলিতে রাজ্যের ক্ষমতা অর্জন হলেই যে বামপন্থী মতাদর্শ কে সুনিশ্চিত ভাবে প্রতিষ্ঠা করা যাবে এবং সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যাবে তা বলা মুশকিল ছিল যার প্রমাণ ১৯৬৭ সালে কেরালা ও পশ্চিমবঙ্গে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করে- জমি থেকে উচ্ছেদ বন্ধ, খাস জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণ ও ভাগচাষী বা বর্গাদারদের অংশ বৃদ্ধি, এইরকম কতগুলি সংস্কারমূলক কাজে হাত দেয়[50] এবং রাষ্ট্রযন্ত্রে, তা কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা প্রবলভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ভারতের মতো দেশে যেখানে কেন্দ্রীয় প্রবণতা রয়েছে সেখানে রাজ্য ক্ষমতা দখলের পর সবচেয়ে বড় প্রশ্ন যেটি সামনে আসে তাহলো মতাদর্শগত অবস্থান ও তার তাত্ত্বিক প্রয়োগ। কংগ্রেস পরিচালিত কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির মধ্যে ঢুকেই হোক বা কমিউনিস্ট পার্টির পাশাপাশি শ্রমিক-কৃষক পার্টির মধ্যে দিয়ে কাজ চালাবার যে রণকৌশল সিপিআই গ্রহণ করেছিল, বহু সময়ে তার কোন সামগ্রিক রূপরেখা ছিল না। তাই এক চূড়ান্ত আন্তর্জাতিকতা নির্ভরতার কারণে জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে কার বামপন্থী অংশটিকে কিভাবে ঘনিষ্ঠ করে তোলা যায়, তার কোন রূপরেখা কোনভাবেই কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব এর কাছে ছিল না, ১৯৩০ সালে অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ না করা, ১৯৩৯ সালের ত্রিপুরা কংগ্রেসের অধিবেশনে নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ, ১৯৪২ সালে ভারত ছাড়ো আন্দোলনে ব্রিটিশদের পক্ষ নেওয়া, নতুন সমাজ সভ্যতা

[49] সরোজ মোহন মিত্র, 'বামপন্থী আন্দোলনের ধারা' অসিত কৃষ্ণ দে সম্পাদিত, কলকাতা, নভেম্বর, ১৯৯৯, পৃ.৩৪

[50] নিম্নবর্গের ভাবনার নতুন আলোক, সত্তর দশক, তৃতীয় অধ্যায়.

গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে বিশেষ করে শ্রেণি ও সাধারণভাবে আপামর শ্রমিককৃষক মেহনতের যে এক - সার্বিক সৃজনশীল চালক ও নিয়ন্ত্রণকারীভূমিকা থাকে তা খারিজ করে দেওয়ায় ভারতীয় বিপ্লবের সঠিক রণনীতি ও রণকৌশল নির্ধারণ ও অনুশীলন এক গুরুতর ব্যর্থতা ও ভ্রান্তির সৃষ্টি করে। সি পি আই, আর এস পি বা তাদের থেকে আলাদা হওয়া ক্ষুদ্র বামপন্থী দলগুলোর কেউই চীন বিপ্লবের সমসাময়িক সময়ে ভারতীয় সমাজে প্রবহমান প্রগতিশীলতার ধারাটিতে বিপ্লবী রাজনীতি ও শ্রেণী সংগ্রামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন গুলিতে সঠিকভাবে অগ্রগতির দিশা হাজির করতে পারেনি, এমনকি শ্রমিক শ্রেণীকে কৃষক শ্রেণীর মধ্যে সংযুক্ত করার কাজও ঠিকভাবে করতে পারেনি বা যে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেছিল তার সম্মুখের সমস্যা গুলোর পর্যাপ্ত সমাধান করতে কিছুটা ব্যর্থ।

*****

তৃতীয় অধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী সরকারের ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৯০ এর মধ্যবর্তী সময়ে নেওয়া কৃষিনীতি

৩.১ ভূমিসংস্কার

৩.২ অপারেশন বর্গা

৩.২.১ অপারেশন বর্গার সাফল্য

৩.২.২ অপারেশন বর্গার তাত্ত্বিক অবস্থান ও বিতর্ক

তৃতীয় অধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী সরকারের ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৯০ এর মধ্যবর্তী সময়ে নেওয়া কৃষিনীতি

নবীন ভারত ১৯৪৭ সালে যে দেশ স্বাধীন হয়েছে সদ্য, তার সামনে দুটি রাস্তা খোলা ছিল মতাদর্শগত দিক থেকে,একদিকে উদারনৈতিক ভাবধারা অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা অর্থাৎ, ক্ষমতা হস্তান্তরের মধ্যেই ভারতকে হয় তার জনগণের জন্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী মতাদর্শে বিশ্বাসী উদারনৈতিক ভাব ধারা নতুবা নিম্ন স্তরের মানুষের নিয়ে প্রলেতারিয়েত একনায়কত্বে বিশ্বাসী সমাজতন্ত্রের ধারণা গ্রহণের হাতছানি, অন্যদিকে বিশাল ভারতবর্ষ যেখানে সকল ধর্মের বর্ণের মানুষের অবস্থান, যেখানে একদিকে উচ্চ শ্রেনীর অবস্থান তেমনি আবার নিম্ন শ্রেনীর অবস্থান যেমন রয়েছে, তেমনি আবার উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে রাজতন্ত্র নামক ধারণার অবস্থানও ছিল, অর্থাৎ, নবীন ভারতের সামনে যেমন স্বাধীনতার অনন্দ ছিল তেমনি আবার নতুন সমস্যায় জর্জরিত ছিল। এর মধ্যেই ৯ই ডিসেম্বর ১৯৪৬ থেকে ২৪ শে জানুয়ারি ১৯৫০ পর্যন্ত সংবিধান সভা ভারতের জন্য যে সংবিধান রচনা করেছিল তার সপ্তম অংশের রাজতন্ত্রের অবস্থানকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। ফলে ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটলেও বিশাল সংখ্যক জনগণ এর অবস্থান কোন পরিবর্তন হয়নি বললেই চলে যার ফলে ভারতের অঙ্গরাজ্যের রাজনীতিতে তিরিশের দশকের কৃষক আন্দোলন যেমন খাজনা, প্রজাস্বত্ব, ক্যানেল কর মহাজন ঋণ ইত্যাদির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়েছিল তা আশির দশকে এসে আরো ভয়াবহ রূপ লাভ করে, যা ফসল ভাগের লড়াইয়ে পরিণত হয় যে আন্দোলনকে ইতিহাসে ১৯৪৬- ১৯৪৭ এ তেভাগা আন্দোলন নামে চেনে. এখানে মূলত গরীব কৃষক ক্ষেত মজুর অংশগ্রহণ করেছিল যার নেতৃত্ব দিয়েছিল কৃষক সভা. আর এর ফলেই- বাংলার ইতিহাসে কমিউনিস্ট পার্টি তাদের অবস্থানকে মজবুত করার জন্য কৃষক সভার মধ্য দিয়ে বাংলায় কৃষক শ্রেণীর সমর্থন অর্জন করে এবং কেন্দ্রে থাকা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নিজেদের অবস্থান সুনিশ্চিত

করে। ১৯৪৭-৪৮ সালের বিশেষ ক্ষমতাবিল, যেখানে বলাছিল - বিনা বিচারে জেল, সংবাদ পত্রের কণ্ঠরোধ, শিল্প ক্ষেতে ধর্মঘাট নিষিদ্ধ করণ, রাজনৈতিক ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করলে কারাবরণ, সরকারী কর্মচারীদের অভিযোগ দাখিল করার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি ইত্যাদি।[1] বাঁশবেড়িয়া, দমদম, জগদ্দল, কামারহাটির বিভিন্ন মিল, কারখানার শ্রমিকরা বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করে, ছাত্ররা ধর্মঘটে সামিল হয়েছিল[2] এরপর ১৯৫৩ সালের 'এক পয়সার আন্দোলন' কমিউনিস্টদের গণ ভিত্তি মজবুত করতে যেমন সাহায্য করেছিল তেমনি ১৯৫৪ এবং ১৯৫৭-৫৮ সালের শিক্ষক আন্দোলন বামপন্থীদের হাত শক্ত করে করেছিল কিন্তু পঞ্চাশের দশকে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির পরিচালনাধীন কৃষকসভার নেতৃত্বে ভূমি সংস্কারের জন্য পশ্চিমবঙ্গের কৃষক সভা আন্দোলন শুরু করে যা বামপন্থী ধারার মতাদর্শকে বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছিল, যদিও ১৯৫৫ সালে কংগ্রেস সরকার বিধানসভা প্রজাস্বত্ব আইন, বর্গাদার আইন উচ্ছেদ করে একটি ভূমি সংস্কার বিল পেশ করে, এই বিলে জমির উর্দ্ধতন সীমা নির্ধারণ, রাজস্ব বর্গাদার ও রায়তদের অধিকার বিষয়ে আইন প্রণয়ন করা হলেও আইনে অনেক ফাঁকিও থাকে ভূমি মালিকদের জন্য, ফলে তাতে বর্গাদার বা কৃষকদের কোন উপকার হয় না। কৃষক সংগঠনগুলির তাদের আন্দোলন চালিয়ে যায়, যেখানে মূলত তাদের দাবি ছিল- 'খাস জমি বন্টন', 'বর্গ স্বত্ব', 'খাদ্য', 'কাজ', 'মজুরি' ইত্যাদি[3] নিয়ে কৃষক সভার মাধ্যমে যে ব্যাপক আন্দোলন হয়েছিল তার ওপর ভর করে ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে সিপিএম ব্যাপক সাফল্য পায়। এই সাফল্যের পিছনে ছিল সারা ভারত কৃষক সভার বার্ষিক সম্মেলনে ১৯৫৩ সালের গৃহীত প্রস্তাব, বন ভূমি সংস্কার আইন পাস হওয়ার আগে ভূ স্বামী শ্রেণি ব্যাপক উচ্ছেদ করে তাদের জমি অধিকারের অভিযান শুরু করেছিল, উচ্ছেদ বন্ধ করা ছিল কৃষকসভার আসু দায়িত্ব।[4] ১৯৫৪ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার উচ্ছেদের হিড়িক দেখে একটি জরুরী

---

[1] Home (poll) file (Secret) 1947, file no.344 of 1947(Converted from file 24-01 of 1947. Serial no.1-28)(West Bengal State Archive,Kolkata, hereafter WBSA)

[2] চন্দন ঘোষ ও অন্যান্য সম্পাদিত, চেতনা, ৫ ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ১৪-১৫

[3] মহাশ্বেতা দেবী ; অগ্নিবীণা

[4] তেভাগা থেকে অপারেশন বর্গাঃ সুনীল সেন ; চতুরঙ্গ, এপ্রিল ১৯৮৭

আইন জারি করে যার ফলে প্রজাদের উচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলন শক্তিশালী হয়। পরের বছর জমির আইন মেয়াদ শেষ হলে আন্দোলনে ভাটা আসে। সত্যিকারের ভূমি সংস্কার, উচ্ছেদ বন্ধ করা, ফসলের লাভজনক দর, পর্যাপ্ত কৃষি ঋণ, প্রভূত দাবি নিয়ে কৃষক সভা অবিরাম প্রচার মূলত আন্দোলন সংগঠিত করে, সরকারের সাথে তারা কোন সংঘর্ষে লিপ্ত হয়না। ১৯৫৯ সালের গ্রীষ্ম কালে গ্রাম থেকে খাদ্যের দাবিতে মিছিল আসে কলকাতা শহরে, যে খানে ৮০ জন কৃষক নিহত হন। সরকারী দমন নীতির জন্য কৃষক আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়ে; সভা আর মিছিলের মধ্যে কৃষক সভার কাজ সীমাবদ্ধ থাকে। ১৯৬২ সালের সাধারণ নির্বাচনে আইনসভায় কমিউনিস্ট দের আসন সংখ্যা হয় ৭২। যা ১৯৫২ সালে ছিল ৩৯।

অবস্থার মৌলিক পরিবর্তনের সূচনা হয় ১৯৬৭-৬৯ পর্বে, কৃষক আন্দোলনের আবার জোয়ার আসে। শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয় ভারতের বেশ কয়েকটি অঙ্গ রাজ্যে কৃষক ও ক্ষেতমজুর ধর্মঘট এবং জমি দখলের আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে,[5] স্বরাষ্ট্র বিভাগের বিবৃতি থেকে জমি দখলের ঘটনায় সংখ্যা জানা যায়; আসাম ৫, অন্ধ্রপ্রদেশ ৫, গুজরাট ১, কেরল ৩, মধ্যপ্রদেশ ৫, মহারাষ্ট্র ১,মহীশূর ১, উড়িয়া ৩, পাঞ্জাব ৩, তামিলনাড়ু ২, উত্তর প্রদেশ ৫, পশ্চিমবঙ্গের জমি দখলের ঘটনায় সংখ্যা ৩৪৬, আর জমির পরিমাণ ৩ লক্ষ একর। ওই পর্বেই ১৯৬৭ সালে বামপন্থী দলগুলো বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে মিলিত হয়ে যুক্ত ফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠন করে।[6] ওই বছরের গ্রীষ্ম কালে নকশালবাড়ি অঞ্চলে মজুত উদ্ধার এবং জোর করে জমি চাষ করা শুরু হয়, ২৪ শে মে পুলিশ ও কৃষকের মধ্যে সংঘর্ষ হয়, পরেরদিন কৃষক মিছিল গ্রাম পরিক্রম করে; পুলিশের গুলিতে ৯ জন কৃষক মারা যান।[7] তার পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে ওঠে নকশালবাড়ি আন্দোলন। ১৯৬৯ সালের যে নির্বাচন হয়েছিল তাতে কংগ্রেস পেয়েছিল মাত্র ৫৫ টি আসন। যার ফলে দ্বিতীয় যুক্ত ফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। আর ওই সালের মে মাসে শুরু হয় বে-নাম জমি দখলের রাজ্যব্যাপী গণআন্দোলন। যা তীব্র হয়েছিল

[5] সরোজ মোহন মিত্র, 'বামপন্থী আন্দোলনের ধারা' অসিত কৃষ্ণ দে সম্পাদিত, কলকাতা, নভেম্বর, ১৯৯৯, পৃ.৩৪

[6] তেভাগা থেকে অপারেশন বর্গাঃ সুনীল সেন ; চতুরঙ্গ, এপ্রিল ১৯৮৭

[7] Barrington Moore, Social Origin of Dictatorship and Democracy, 1967

২৪ পরগণা, মেদিনীপুর, বর্ধমান, হাওড়া-হুগলি এবং পশ্চিম দিনাজপুরে। ২৪ পরগনায় কৃষকরা দখল করেছিল প্রায় ৮৫ হাজার একর জমি, আইনকে ফাঁকি দিয়ে জোতদাররা এতকাল যে জমি নিজেদের দখলে রেখেছিল। ১৯৬৭-৬৯ পর্বে জমি দখলের আন্দোলন বিস্তৃত হয় গ্রামে গ্রামে; ১৯৬৯ এর জুন মাসের মধ্যে ৮ হাজার একর জমি দখল করা হয়। কিন্তু ১৯৬৯ সালের মার্চ মাসের কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে বাংলায় যার লক্ষ্য ছিল সিপিআইএমকে দমন করা। ফলে কৃষক সভার নেতা জয়ন্ত ভট্টাচার্য কলকাতায় আশ্রয় নেয়। দমননীতির মুখে রাজ্যে সর্বত্র কৃষক আন্দোলন পিছু হটলে, কলকাতায় কোন প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে নি।[৪]

মরা গাঙে জোয়ার এলো ১৯৭৮ সালে। ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এলে আবার শুরু হয় বে-নাম জমি দখলের পুরনো আন্দোলন, আন্দোলনের ধরন ও পুরনো- লাঠিধারী স্বেচ্ছাসেবকদের অভিযান। বামফ্রন্ট সরকার একদিকে গরীব কৃষকদের জন্য জমি বন্টন করলেন, অপরদিকে জমি সংস্কার আইন সংশোধন করে বর্গাদারের স্বার্থ সুরক্ষিত করার চেষ্টা করা হয়। ওই পর্বের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল 'অপারেশন বর্গা' যার বিরুদ্ধে উচ্চ বর্ণ থেকে আগত জমি নির্ভর মধ্য বিত্ত গেল, গেল রব তুলেছিল। বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অধিকার বা বর্গাদার বা ভাগচাষীরা সঙ্গবদ্ধ হয়ে উৎপন্ন শস্যের 'এক তৃতীয়াংশ' ভাগ এবং উচ্ছেদ রহিতের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে যা 'তেভাগা আন্দোলন'[9] নামে খ্যাত। এই আন্দোলনের ফলশ্রুতি 'পশ্চিমবঙ্গের বর্গাদার আইন 1950' আইন রচিত হয় সমাজের বৃহৎ অংশের মঙ্গলাথে আইন রচনা করা যত না শ্রমসাধ্য তার বাস্তবায়ন ততোধিক শ্রমসাধ্য। ওই বর্গাদার আইন যেমন আধিকার, বর্গাদার, কৃষাণী, ভাগ চাষী ইত্যাদির স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে যথেষ্ট ছিল না তেমনি যুগ্ম প্রচেষ্টায় কাঠিন্যতাকে অতিক্রম করে প্রাপ্য সম্মান ও সুযোগ সুবিধা টুকুও লাভও প্রদানের ক্ষেত্রে সকলেই উদাসীন ছিলেন। ফলে ওই শ্রেণীর অবস্থার কোন উন্নতিই হয়নি।

[৪] সরোজ মোহন মিত্র, 'বামপন্থী আন্দোলনের ধারা' অসিত কৃষ্ণ দে সম্পাদিত, কলকাতা, নভেম্বর, ১৯৯৯,

[9] তেভাগা থেকে অপারেশন বর্গাঃ সুনীল সেন ; চতুরঙ্গ, এপ্রিল ১৯৮৭

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় জাতীয় নীতি হিসাবে গৃহীত হয় যে জাতীয় অর্থনীতির বুনিয়াদ দৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপনার্থে সবপ্রথম কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা করে কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্য ভূমি সংস্কারকে অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রয়োজন। ওই জাতিভিত্তির পরিপ্রেক্ষিতে 'পশ্চিমবঙ্গ জমিদারি গ্রহণ আইন'-১৯৫৩, এবং পশ্চিমবঙ্গের ভূমি সংস্কার আইন ১৯৫৫ রচিত হয়। ওই আইনটির অধীনস্থ নিয়মাবলীর 26 নম্বর নিয়মে যথার্থ বর্গাদার দের নাম যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ ছিল। তদানুযায়ী উক্ত আইন অনুসারে প্রস্তুত ও স্বত্ব লিপিতেও বর্গাদারদের নাম দৃষ্ট হয়। এই আইনের ৫০ এবং ৫১ নম্বর ধারা জন্য প্রস্তুত নিয়ম ও তপসিলে বর্গাদারদের নাম জমির স্বত্বলিপিতে লিপিবদ্ধ করার নির্দেশও দেওয়া আছে।

জমিদারী গ্রহণ আইন অনুসারে প্রস্তুত স্বত্ব লিপিতে আশানুরূপ বর্গাদার দের নাম লিপিবদ্ধের কাজ হয়নি, পক্ষান্তের পশ্চিমবঙ্গ ভূমিসংস্কার আইন ১৯৫৫ এর তৃতীয় পরিচ্ছদে[10] বর্গাদারদের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে কিছু আইনগত ব্যবস্থা করে ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের জুন মাস থেকে তা বলবৎ করা হয় এবং তার মধ্যে যে সকল বর্গাদারদের নাম ইতিমধ্যে স্বত্ব লিপিতে লিপিবদ্ধ হয়েছিল তারা জমির মালিকের কোপানলে পড়ে এবং নানা প্রকার উৎপীড়নের ও উচ্ছেদের সন্মুখিন যে তাদের হতে হয়েছিল তার প্রচুর নির্দশন প্রায় প্রতিটি গ্রামে পাওয়া যাবে। ফলে তদানীন্তন কালে নথিভূক্ত অনেক বর্গাদারদের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না।

ভূমি সংস্কারের কাজ ত্বরান্বিতনা হওয়ায় গ্রামীণ অর্থনীতি এমন পর্যায়ে এমন দাঁড়িয়েছে যে ক্রমবর্ধমান লোক সংখ্যার সাথে কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনে সামঞ্জস্য হীন হয়ে পড়েছে। পশ্চিমবঙ্গের ৩০ শতাংশ ব্যক্তি শহর অঞ্চলে বসবাস করেন[11] এবং চাকুরী, ব্যবসা ইত্যাদি অন্যান্য পেশার মাধ্যমে জীবন যাপন করেন। খাদ্যের জন্য তাদের সম্পূর্ণভাবে কৃষকদের ওপর নির্ভর করতে হয়। কিন্তু কৃষক শ্রেণী যাদের একটি বৃহৎ অংশ বর্গাদার তারা যে অবস্থার মধ্যে দিনাতিপাত করছে তা আর বেশি দিন চললে, অন্যান্য জীবিকার মানুষদের অর্থ জোগানোর মুখ্য উদ্দেশ্য পূরণ হওয়ার

[10] টোডরমল ঃ পশ্চিমবঙ্গ ভূমিসংস্কার আইন

[11] নিরুপম সেন ; পশ্চিমবঙ্গের কৃষি, পৃঃ ১৯৫

সামান্যতম সম্ভবনাও তিরোহিত হবে। এই উপলব্ধি আজ জাতীয় পর্যায়ে বিরাজমান। স্বাধীনত্তোর ভারতবর্ষে উন্নয়নের ক্ষেত্রে কোটি কোটি কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে- নিঃসন্দেহে প্রাক স্বাধীনতা যুগাপেক্ষা দেশের উন্নতি হয়েছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক ফল লাভ হয়েছে বিপরীত। প্রাক স্বাধীনতার যুগের ৪০ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে ছিল- বর্তমানে ৬০ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে চলে গেছে। এই দরিদ্র সীমার নিচে অবস্থিত মানুষদের অধিকাংশ কৃষক জগতের সাথে যুক্ত যাদের মধ্যে বর্গাদারদের সংখ্যা প্রচুর।

কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনের মূল্ উপাদন দুইটি- জমি এবং অর্থ, যা বর্গাদারদের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। এই জন্য কৃষি জগতের স্বার্থেই ভূমি সংস্কার আইন এর তৃতীয় পরিচ্ছেদ রচিত এবং বর্গাদার কৃষকদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা সরকারিভাবে গৃহীত হয়েছে। কিন্তু বর্গাদারদের নাম স্বত্বলিপিতে অন্তর্ভুক্ত না হলে সকল ব্যবস্থাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। এজন্য বর্গাদারদের নাম স্বত্ব লিপিতে দ্রুত লিপিবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ‘অপারেশন বর্গা’ বা ‘বর্গাদারের অন্বেষণে’ শিরোনামে সিপিআইএম সরকার একটি প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

এই অপারেশন বর্গা বা বর্গাদারের অন্বেষণের কর্মপদ্ধতিকে পাঁচটি ভাগে[12] বিভক্ত করা যায়-

১. কার্যারম্ভের পূর্বে জেলা অথবা মহকুমা স্তরে স্থানীয় কৃষক সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সাথে সরকারি পর্যায়ে আলোচনার মাধ্যমে অধিক সংখ্যায় বর্গাদার অধ্যুষিত অঞ্চলকে চিহ্নিত করা।

২. এই কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অঞ্চল ভিত্তিক সরকারি কর্মীদল নিয়োগ। এই দল এলাকাস্থ অধস্তন ভূমি সংস্কার অধিকারীক, সেটেলমেন্ট কানুনগো গ্রেড ১ অথবা ২, অভিজ্ঞ আমীন এবং পিয়ন দিয়ে গঠন করা। এই কর্মীদলের কাজের তদারকির দায়িত্ব মহাকুমা শাসক, মহকুমা ভূমি সংস্কার অধিকারিক এবং ভূ-বাসন দপ্তরের আধিকারিক এর উপর অর্পণ।

[12] Harkishan singh surjeet; land reforms in india

৩. কার্যারম্ভের পূর্বে উপরক্ত দল এবং প্রশাসনিক স্তরের উচ্চ পদাধিকারী ব্যক্তিগণ কর্তৃক নির্দিষ্ট মৌজায় আয়োজিত সান্ধ্য বৈঠকে গ্রামবাসীদের সাথে মিলিত হয়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যথার্থ বর্গাদারদের নামের তালিকা সংগ্রহ এবং তাদের জীবিকার সমস্যাগুলো সম্পর্কে তথ্য আহরণ করে সমাধানের ব্যবস্থা করা।

৪. সরকারি দলটি নির্দিষ্ট দিনে মৌজা উপস্থিত হয়ে তিন দিনের মধ্যে বৃহৎ মৌজার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, মৌজার নকশার সাহায্যে সরেজমিনে প্রকাশ্য তদন্তের মাধ্যমে বৈঠকে গৃহীত বর্গাদারদের তালিকা অন্তর্গত এবং তদন্ত চলাকালীন প্রাপ্ত যথাথ বর্গাদারদের নাম নথিভুক্ত করা। নথিভূক্ত বর্গাদারদের নাম প্রকাশ্য স্থানে আপত্তির দাখিলের সুযোগ প্রদান করে ২৪ ঘন্টার জন্য টাঙিয়ে দেওয়া। এই সময়ের মধ্যে যদি কোন বর্গাদার সম্পর্কে কেউ কোন আপত্তি দাখিল করেন, রাজস্ব অধিকারী কর্তৃক তাহার যথাযথ শুনানির পর সিদ্ধান্ত প্রদান।

৫. বর্গাদারদের নাম স্বত্ব লিপিতে অন্তর্ভুক্তির পর তাদের সকলের নির্দিষ্ট ফর্মে প্রমাণ পত্র প্রদান।

অপারেশন বর্গা এর ক্ষেত্রে তিনটি Condition[13] এর কথা বলা হয়েছিল -

1. The Landowner had to prove that the land in question constitutes the principal source of his Income and he had no other source of Income.

2. The landowner is required to be living within 8kms. Of the agriculture land al least for 6 months in a year.

3. The landowner has also to prove that after talking back the land he will cultivate the Same personally or through his family labour and not through wage labourers.

[13] Harkishan singh surjeet; land reforms in india

যে সকল মৌজায় অদ্যবধি ভূমি সংস্কার আইন অনুসারে জমির স্বত্বলিপি প্রস্তুতের কার্যারম্ভ হয় নাই এবং যে সকল মৌজায় জমির স্বত্বলিপি প্রস্তুতের কাজ চলিতেছে, কিন্তু চূড়ান্ত প্রকাশনা হয় নাই উভয় ক্ষেত্রেই অপারেশন বর্গা বা বর্গাদারের অন্বেষণের কার্য পদ্ধতিতে পশ্চিমবঙ্গের ভূমি সংস্কার আইন ১৯৫৫ এর যথাক্রমে ৫০ এবং ৫১ ধারা[14] তদ অধিনস্ত নিয়মাবলী ও তপশিল অনুসারে বর্গাদারদের নাম জমির স্বত্ব লিপিতে সংযোজন হইতে পারে।

এই কার্য পদ্ধতি ও শর্তাদি থাকার সত্বেও পশ্চিমবঙ্গ এ ৩১-০১-১৯৭৯ সালের মধ্যে ৫৭২৬৯৪ বর্গাদার তাদের নাম নথিভুক্ত করে যা ১৯৯০ পর্যন্ত ১৪,৫০,০০০ এ এসে দাঁড়ায়। আর এটাই ছিল সি পি আই এম এর সবচেয়ে বড় সাফল্য, যা তারা নিজেরাও মনের করে।

২০০৬ সালে ‘world development report’ বামফ্রন্ট সরকারের ভূমি সংস্কার কর্মসূচির সপ্রশংসা উল্লেখ করে। ভূমি সংস্কারের ফলে পশ্চিমবঙ্গে ৩০ লক্ষধিক কৃষক পেয়েছেন ১১ লক্ষ ২৭ হাজার একরেরও বেশি জমি। পাট্টা প্রাপকদের প্রায় ৩৭ শতাংশ তপশিলি জাতিভুক্ত, প্রায় ১৮ শতাংশ আদিবাসী এবং ১৮ শতাংশ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের।[15] নারী-পুরুষ যৌথ পাট্টা দেওয়া হয়েছিল ৬ লক্ষ ১৮ হাজারের বেশি। জমি পাট্টা বিলি ধারাবাহিকভাবে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ১৫ লক্ষ ১৩ হাজার নথিভূক্ত বর্গাদার আইনি অধিকারে সুরক্ষিত, বামফ্রন্ট সরকারের সময় কালে বর্গা জমির পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল প্রায় ১১ লক্ষ ১৫ হাজার একর। ভূমি সংস্কারের ফলে পশ্চিমবঙ্গের ভূমি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে। এই কর্মসূচি ভূমি ক্ষেত্রে সামন্ততান্ত্রিক ও আধা সামন্ততন্ত্রের উপর আঘাত হেনে ছিল। ভূমি সংস্কার কর্মসূচি প্রথমত, কৃষক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে, ১৯৮০ র দশকে কৃষি উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ সারা দেশে প্রথম স্থান আসে। ফলে সরকার কৃষক শ্রেণীর মধ্যে নিম্নস্তরের তাদের অবস্থানকে দৃঢ়তা দেয় যার সুবাদে ১৯৭৮ সালে প্রথম ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় বামফ্রন্ট যথাযথ গ্রামীণ মানুষের সামনে তুলে ধরে গ্রামে

[14] টোডরমল ঃ পশ্চিমবঙ্গ ভূমিসংস্কার আইন

[15] বামফ্রন্ট সরকার একটি পর্যালোচনা(খসড়া); ২৩-২৪ ফেব্রুয়ারী ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত ২৯ তম অধিবেশনে গৃহীত।

গ্রামে পুরনো ক্ষমতাশীলদের 'বাস্তু ঘুঘুর বাসা ভাঙো'[16]। ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে রাজ্যের গ্রামের মানুষ আর্থিক সুরক্ষার এক উন্মুক্ত পথ দেখেছিল অন্যদিকে পঞ্চায়েত নির্বাচন গ্রামীণ মানুষকে রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতা ব্যবহার করতে শেখায়। পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় গ্রামের দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক সম্পর্ক এবং ক্ষমতার মূলে আঘাত হেনেছে। যার ফলে বামফ্রন্ট সরকার বর্গাদার ব্যবস্থাকে নির্দিষ্ট 'মৌজা' ভিত্তিক ভাগ করে বর্গা ব্যবস্থাকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে সকল সফল হয়।

পশ্চিমবঙ্গের কৃষিতে উন্নয়নের ভীত ভূমিসংস্কার কর্মসূচির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই কর্মসূচিতে একদিকে সীমা উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টন করা হয়েছে। অন্যদিকে আইনসম্মত পথে বর্গাদারদের জমির উপর অধিকার সুনিশ্চিত করা হয়েছে। ভূমিসংস্কারের ফলে উপকৃত দরিদ্র চাষীদের হাতে উৎপাদনমুখী কাজ শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজি বা সম্পদ থাকে না। ফলত ভূমিসংস্কারকে প্রকৃত অর্থে কার্যকর করে তোলার লক্ষ্যে দরিদ্র চাষীদের জন্য কৃষিঋণ, বীজ, সার, সেচ ইত্যাদি জমি – বহিঃভূত সহায়তা দেওয়ার বিষয়েও রাজ্য সরকার নিজের আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল। সমগ্র কর্মসূচিটিই রূপায়িত হয়েছিল বিকেন্দ্রীভূত উন্নয়ন ও পরিকল্পনা ব্যবস্থার মাধ্যমে যার মূলে রয়েছে শক্তিশালী পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলি।[17] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য করা যায় যে গ্রাম অঞ্চলের দরিদ্র চাষী রায় পঞ্চায়েত সংস্থাগুলির মূল নীতি- নির্ধারক শক্তি। স্পষ্টতই পশ্চিমবঙ্গে কৃষিতে উন্নয়ন ও বিকাশের নীতি ও কর্মসূচি রূপায়নের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও দরিদ্র চাষীদের মিলিত উৎপাদিকা শক্তির উপর নির্ভর করা হয়েছে। প্রসঙ্গত বলা যায় ১৯৮১-৮২ থেকে ১৯৯১-৯২ সালের মধ্যবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য শস্য উৎপাদনের বার্ষিক যৌগিক বিকাশের হার ছিল ৬.৫ শতাংশ। এই বিকাশের হার সমকালীন প্রধান রাজ্য গুলির সংশ্লিষ্ট বিকাশের হারের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। সুতরাং কৃষিতে বিকাশের হার ত্বরান্বিত করার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য সরকার পশ্চিমবঙ্গের ছোট চাষীদের স্বার্থ রক্ষা করতে সফল হয়েছে। এই রাজ্যে দরিদ্র চাষীদের শ্রমের

[16] তেভাগা থেকে অপারেশন বর্গাঃ সুনীল সেন ; চতুরঙ্গ, এপ্রিল ১৯৮৭

[17] তাহাদের কথা, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন সংস্থা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০৩

মূল্যে অর্জিত কৃষিতে উন্নয়নের সুফল পাঞ্জাব হরিয়ানা মত বিত্তবানদের কুক্ষিগত হয়নি। বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত গ্রামীণ শ্রম সংক্রান্ত তদন্ত রিপোর্ট থেকে দেখা যায়, পশ্চিমবঙ্গের জমির মালিক এমন কৃষি শ্রমিক পরিবারের সংখ্যা সাম্প্রতিককালে ঊর্ধ্বমুখী হারে বেড়ে চলেছে যা ভূমি সংস্কারের সাফল্য প্রমাণ করে। নিচের সরণি থেকে দেখা যায় যে পশ্চিমবঙ্গের জমির মালিকানা সমেত কৃষি শ্রমিক পরিবারের আনুপাতিক পরিমাণ ১৯৭৭-৭৮ সালের ৪৫.৬৬ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৯৯৩-৯৪ সালে ৪৯.২৮ শতাংশ তে পৌঁছে ছিল।[18] এক্ষেত্রে সর্বভারতীয় গড় ছিল ১৯৭৭-৭৮ সালে ৪৮.৬৩ শতাংশ এবং ১৯৯৩-৯৪ সালে ৪৩.০৩ শতাংশ।

জমি আছে এমন শ্রমিক পরিবারের শতকরা হিসাবঃ ভারতবর্ষ ও পশ্চিমবঙ্গ

	১৯৭৪-৭৫	১৯৭৭-৭৮	১৯৯৩-৯৪
পশ্চিমবঙ্গ	৪৫.৮০	৪৫.৬৬	৪৯.২৮
সারা ভারত	৪৯.২০	৪৮.৬৩	৪৩.০৩

সূত্রঃ- শর্মা (২০০১, ২৯)

উপরের তথ্যগুলো আরো একবার দেখায় যে এই রাজ্যে কৃষিতে বিকাশ ত্বরান্বিত করার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের স্বার্থ রক্ষা করা এবং তাদের অবস্থার আপেক্ষিক উন্নতি ঘটানো সম্ভব হয়েছে একই রিপোর্ট থেকে পাওয়া পশ্চিমবঙ্গের কৃষি শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের প্রকৃতিগত গঠনের পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির একটি ছবি নিচে দেওয়া হলো বলাবাহুল্য এই তথ্যটিও রাজ্যের ভূমি সংস্কার ও দরিদ্র চাষির ভালো-মন্দের বিষয়ে একটি ছবি ফুটিয়ে তোলে।

[18] নিরুপম সেন ; পশ্চিমবঙ্গের কৃষি, পৃঃ ১৮২

১৯৭৪-৭৫ থেকে ১৯৯৩-৯৪ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ কৃষি শ্রমিকের কাজের পরিবর্তনশীল ধরন(শতকরা)

	১৯৭৪-৭৫	১৯৭৭-৭৮	১৯৮৩	১৯৮৭-৮৮	১৯৯৩-৯৪
মজুরি ভিত্তিক কর্মবিনিয়োগ	৯০.২৭	৮৪.৩০	৮২.৮৯	৮০.৮৭	৭৮.৫০
স্ব নিযুক্তি	৮.৫৬	১৪.৩৩	১৫.৯৭	১৬.১১	১৯.৭৯
মাহিনা ভিত্তিক কর্ম- নিযুক্তি	১.১৭	১.৩৭	১.১৪	৩.০২	১.৭১
মোট	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০

সূত্রঃ- শর্মা (২০০১, ৩২)

বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসে ১৯৭৭-৭৮ সালে। তখন থেকে ১৯৯৩-৯৪ সালের মধ্যবর্তী সময়ে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ কৃষি শ্রমিকদের ক্ষেত্রে মোট কর্মসংস্থানে মজুরি নিযুক্তির অংশ ৫.৮ শতাংশ সূচক পরিমাণে কমেছে কিন্তু স্বনিযুক্তি অংশ ৫.৬ শতাংশ পরিমাণ বেড়েছে। গ্রাম অঞ্চলে জমিই স্বনিযুক্তির প্রধান উৎস। তাই বলা যেতে পারে যে ভূমিহীনদের জমি দেওয়া এবং চাষিদের হাত থেকে জমি কেড়ে নেওয়া প্রতিরোধ করা এই দুই কাজ সফলভাবে করা সম্ভব হয়েছে বলেই স্বনিযুক্তি ক্ষেত্রে এই আপেক্ষিক উন্নতি দেখা যাচ্ছে।

জোত জমির সংখ্যা এবং আয়তন গত বন্টনের রেখাচিত্র গত ৩০ বছরের ব্যাপ্তিতে পর্যবেক্ষণ করলে পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার কর্মসূচির প্রভাব সহজেই বোঝা যায়। ১৯৭০-৭১, ১৯৯০-৯১ এবং ১৯৯৫-৯৬ সালের সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি নিচের সারণীতে দেওয়া হল।

অপারেশন হোল্ডিং এর সংখ্যা ও আয়তন ভিত্তিক বিভাজনের চিত্র

(শতকরা)

সাল	১৯৭০-৭১	১৯৭০-৭১	১৯৯০-৯১	১৯৯০-৯১	১৯৯৫-৯৬	১৯৯৫-৯৬
আয়তন /শ্রেণি (হেঃ)	সক্রিয় সংখ্যা	এলাকা	সক্রিয় সংখ্যা	এলাকা	সক্রিয় সংখ্যা	এলাকা
১ এর নীচে	৬০.৩	২১.৫	৭৩.৮	৩৬.৫০	৭৬.৪২	৪২.৯৩
১-২	২২.৩	২৫.৭	১৭.৬২	২৯.৯৬	১৬.৮১	২৯.০৬
৩-৪	১৩.২	২৮.৯	৭.২৮	২২.৪০	৫.৩৮	১৮.৭৩
৫-১০	৪.২	১৯.২	১.২৬	৭.৫২	০.৯২	৫.৬৬
১০ এবং তার উপর	সামান্য	৪.৬	০.০২	৩.৫৮	০.০২	৩.৬২

সূত্রঃ- এগ্রিকালচার সেন্সাস, পশ্চিমবঙ্গ ১৯৮০-৮১ এবং ১৯৯৫-৯৬

উপরের সারণিতে পরিষ্কার দেখা যায় যে পশ্চিমবঙ্গের ধনী ভূস্বামী শ্রেণি ক্রমাগত যথেষ্ট দুর্বল হয়ে পড়েছে। এই সারণি থেকে রাজ্যে জোতজমি উত্তরোত্তর খন্ডিত হওয়ার ছবিও পাওয়া যায়।

পশ্চিমবঙ্গের ভূমি সংস্কার শুধু সরকারি প্রচেষ্টার ফল নয়। এই পরিবর্তন গ্রামের দরিদ্র মানুষের দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক আন্দোলনের ফল। এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব গ্রামীণ অভিজাত শ্রেণীর সামাজিক প্রতিপত্তি অনেকাংশে হ্রাস পাই। এর সঙ্গে ১৯৭৮ সালে রাজ্যে অনুষ্ঠিত হলো প্রথম পঞ্চায়েত সাধারণ নির্বাচন এবং প্রতিষ্ঠিত হয় এটি সুসংবদ্ধ ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা। ধারাবাহিক সামাজিক আন্দোলনের পথ ধরে এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় গ্রামীণ দারিদ্র্য মানুষের কার্যকরী নিয়ন্ত্রণও প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯৩ সালে নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্যদের শ্রেণীবিন্যাসের তথ্য বিশ্লেষণ করা যেতে

পারে, এ বিষয়ে একটি উন্নত জেলা বর্ধমান এবং একটি অপেক্ষাকৃতভাবে কম উন্নত জেলার যেমন জলপাইগুড়ি জমির মালিকানার ভিত্তিতে শ্রেণী বিন্যাসের চিত্র আলোচনা করা হলো।

জমির মালিকানা অনুযায়ী বর্ধমান এবং জলপাইগুড়ি জেলার গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যদের বিভাজন

জমির মালিকানা	জলপাইগুড়ি	বর্ধমান
ভূমিহীন	৪৯২(২৪.৬৪)	২২৫০(৪১.৯৭)
পাট্টাদার	১২৬(৬.৩১)	২৮৬(৫.৩৩)
২.৫০ একর পর্যন্ত	৭৭৫(৩৮.৮১)	২০৭৬(৩৮.৭২)
২.৫১ থেকে ৫.০ একর পর্যন্ত	৪১৫(২০.৭৮)	৫৪৪(১০.১৫)
৫.০১ থেকে ১০.০ একর পর্যন্ত	১৬৫(৮.৬২)	১৮৬(৩.৪৭)
১০ একরের বেশী	২৪(১.২০)	১৯(০.৩৬)
মোট	১৯৯৭(১০০)	৫৩৬১(১০০)

(বন্ধনীর ভেতর সংখ্যাকে শতকরা বুঝতে হবে)

সূত্রঃ- সোসিও ইকোনমিক প্রফাইল অফ পঞ্চায়েত মেম্বারস, বর্ধমান, জলপাইগুড়ি- গভমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল

উপরের সারণি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে ভূমিহীন এবং দারিদ্র্য চাষিরা শক্তিশালী হয়েছিল। এই পরিস্থিতি গ্রামীণ সামাজিক ক্ষমতা বিন্যাসের একটি নতুন ধারার ইঙ্গিত দেয় যেখানে জমিদার এবং অভিজাত শ্রেণীর আর্থ-রাজনৈতিক প্রতিপত্তির সূর্য অস্তমিত। অনেকটা জোর দিয়ে বলা যায় যে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ শ্রমিক শ্রেণীর নিজের বাঁচার পথ অনেকাংশে নিজেই বাছতে পারে। গ্রামীণ জমিদারদের ক্ষমতা হ্রাস ও জমির সমবন্টনের ফলে এবং অন্যান্য 'উৎস' থেকে আয়ের সুযোগ কম থাকার ফলে গ্রাম বাংলার উচ্চ উৎপাদনশীল কৃষিই প্রধান উৎস হয়ে দাঁড়ায়। এইভাবে আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে দীর্ঘস্থায়ী অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়েছিল।

আশির দশকের শুরুতে ক্ষমতার পুনর্বিন্যাসের নতুন কাঠামো তৈরি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামীণ দরিদ্র চাষীদের সামাজিক শক্তিবৃদ্ধির এই চেহারা ক্রমাগত স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। সামগ্রিক উন্নয়নে রাজ্যের সম্পদ কাজে লাগানো হয় পঞ্চায়েতের মাধ্যমে যেখানে গ্রামীণ দরিদ্র শ্রেণীর অংশগ্রহণ ছিল সুনিশ্চিত। অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল ক্ষুদ্র ও মাঝারি চাষিরাও এই নতুন ব্যবস্থায় উপকৃত হন। স্বার্থের প্রশ্নে এই দুই শ্রেণীর পারস্পরিক দূরত্ব কমে আসে। প্রভাবশালী দারিদ্র্য চাষিরা উচ্চতর হারে কৃষি মজুরি দেওয়ার বিষয়টিকে সময় ও বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে মানানসই পথে এগিয়ে দেন। ফলে কৃষিতে ক্রমবর্ধমান উৎপাদনশীলতার সুফল মজুরি শ্রমিক এবং ছোট জমির মালিকের কাছে সমানুপাতে পৌঁছায়। এইভাবে রাজ্যে কৃষি শ্রমিক ও মালিকের স্বার্থ রক্ষায় পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে দীর্ঘস্থায়ী গ্রামীন বিকাশের এক নতুন অধ্যায় সূচিত হয়।

জমির মালিক চাষী, ভূমিসংস্কারের উপকৃত ব্যক্তিরা এবং অন্যান্য দরিদ্র চাষিরা এই অনুকূল পরিবেশকে কাজে লাগিয়ে, জমির উৎপাদনশীলতা এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক ক্রিয়া-কলাপের সার্থকতা বৃদ্ধির কাজে সচেষ্ট হয়।

ভূমিসংস্কার বা অপারেশন বর্গার ফলে রাজ্যের কৃষি উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য বিকাশ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। ১৯৮০ থেকে ২০০১ পর্যন্ত বিগত দর্শকের কয়েকটি বছরের প্রধান শস্য গুলির উৎপাদনের তথ্য সারণী লক্ষ্য করলে দেখা যায় উৎপাদনের ঊর্ধ্বমুখী গতির ধারণা ।

প্রধান শস্যের উৎপাদন

শস্যের নাম	১৯৮০-৮১	১৯৮৬-৮৭	১৯৯৮-৯৯	১৯৯৯-২০০০	২০০০-২০০১
ধান	৭৪.৬৬	৮৪.৬৩	১৩৩.১৬	১৩৭.৬০	১২৪.২৮
গম	৪.৭৩	৬.৮৩	৭.৭৮	৮.৫১	১০.৫৯
দানাশস্য	৮২.৮২	৯৬.২৬	১৪৩.৬৭	১৪৮.৪৬	১৩৭.৯২
পাট(লক্ষ্য গাট)	৪৪.৪৩	৪৯.৫০	৭৩.৭৪	৭৫.৯৪	৭৪.২৮
আলু	১৯.৭২	৩৫.৪২	৬৬.৯০	৭৪.৮২	৭৬.৮২

অন্যান্য	১.৫০	২.৬৪	৩.৭৯	৪.০৬	৫.৬২

সূত্রঃ- পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত আর্থিক সমীক্ষা সমূহ

অপারেশন বর্গা কে সাধারণভাবে সিপিআইএম এর একটি সফল কর্মসূচি বলে মনে হলেও এর রূপায়নে বিচ্যুতি ছিল, এই কর্মসূচি উস্কে দিয়েছিল তথা জন্ম দিয়েছিল নানা ধরনের বিতর্ক। প্রথমত খাতা-কলমে বর্গাদারীত্ব পেলেও বাস্তবে বর্গাদাররা অনেক ক্ষেত্রে জমির মালিককে ন্যায্য ভাগের ফসল না দেওয়ার ফলে কৃষক আন্দোলনের মিত্র অংশটি ক্রমশ বিরূপ যেমন হয়েছে, তেমনি প্রশ্ন উঠেছে অপারেশন বর্গা প্রয়োগ নিয়েও। 'কৃষকের হাতে জমি চাই'- স্লোগান দিয়ে ভূমি সংস্কারের পর্ব শুরু হয় এবং জমির মালিকদের জন্য একটি সিলিং এর মাত্রা ঠিক হয়। আন্দোলনের ফলস্বরূপ আইনি সংস্কারের সূচনা হয়। কিন্তু গ্রামাঞ্চলের জমিদারদের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিপত্তি থাকার জন্য বা সরকার তাদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য জমিদাররা বিভিন্ন নামে বে-নামে জমি কব্জা করে রেখেছিল। রায়তি জমি প্রমানের ভিত্তি হলো ভূমিস্বত্ব লিপি। স্বত্বলিপি বিভিন্ন সময়ে হওয়ার জন্য এবং জমি হস্তান্তরের সুবাদে তাদের নাম ও পাল্টে গেছে, ফলে সিলিং এ যেমন ফাঁকি দিয়েছে তেমনি বেনাম জমিও রেখেছিল। ১৯৪০ এর তেভাগা আন্দোলনই প্রথম বর্গাদারদের অধিকারের প্রশ্ন সামনে নিয়ে আসে। উৎপাদন শক্তি অর্থাৎ কৃষক জনগণ উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তনের লড়ায়কে সামনে আনে। ১৯৪০ সালে ক্লাউড কমিশন বর্গাদারদের রায়ত হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার সুপারিশ করলেও যুক্তফ্রন্টের হরে কৃষ্ণ কোঙার এবং বামফ্রন্টের বিনয় চৌধুরী বলেন-'বর্গাদারদের রায়তি স্বত্ব দেওয়ার সময় এখনও আসেনি'। যা ১৯২৮ সালে Bengal legislative counal এ বিতর্কের সময় কংগ্রেসের তরফ থেকে ডঃ বিধান চন্দ্র রায় একই কথা বলেছিলেন।[19] যার ফলে অনেক বিশ্লেষক মনে করেন- সি.পি.আই.এম কেন বর্গাদারদের রায়তি স্বত্ব বা মালিকানা দেওয়ার ব্যাপারে সম্মত নন তার কারণ খুব স্পষ্ট- তারা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার কে ভাঙতে বা মুছে ফেলতে চান না, তার জন্যই 'অপারেশন বর্গা' কর্মসূচির মাধ্যমে শুধু বর্গাদার আইনি ভাবে নথিভুক্ত করাকেই ভূমি সংস্কারের সাফল্য হিসেবে দেখতে

[19] তেভাগা থেকে অপারেশন বর্গাঃ সুনীল সেন ; চতুরঙ্গ, এপ্রিল ১৯৮৭

চেয়েছেন, জমির মালিকানা রইল আগের মত জোতদারের হাতে। এই জোতদারদের একটি অংশ মধ্যবিত্ত। এর প্রধান উদ্দেশ্য উচ্ছেদ বন্ধ এবং বর্গাদারকে পুরুষানুক্রমে জমি চাষ করার অধিকার দেওয়া। বর্গাদারের নাম নথিভুক্ত হলে তাকে উচ্ছেদ করা অপেক্ষাকৃত কঠিন; বর্গাদারদের পক্ষে ফসলের বর্ধিত ভাগ(৭৫%) আদায় করা সম্ভব। রেকর্ডেড বর্গাদারের পক্ষে সরকারি ঋণ পাওয়ার পথ সুগম হয়েছিল, তাদের কে জোতদারদের কাছে আর হাত পাততে হবে না কিন্তু তাত্ত্বিক দিক থেকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে এইখানেও অপারেশন বর্গার মাধ্যমে সিপিআইএম তাদের মতাদর্শের বিপরীত দিকে সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেননা ঋণ ব্যবস্থার নির্দিষ্ট কোনো সিদ্ধান্ত না নিয়ে কেবল ঋণ প্রদানের অবস্থানের পরিবর্তনের দিকে তারা গুরুত্ব দিয়েছে জোতদার ঋণ থেকে সরকারি ঋণ অর্থাৎ শ্রেণী সংগ্রামের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে সিপিআইএম শ্রেণীর ধারণা গড়ে তোলার জন্য অর্থনীতি দিক থেকে কৃষক সম্প্রদায়ের উন্নত স্তরে না নিয়ে এসে সরকারী ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীলতা দিকে ঠেলে দিয়েছে। তাই বামফ্রন্ট সরকারের ভূমি নীতি বর্গ নীতি যে জোতদার ও ধনী কৃষকদের স্বার্থবাহী সেটাই দেখিয়ে দেয়।

অনেকে বলেছেন যে সিপিআইএম তাদের 'অপারেশন বর্গা'র সাফল্যের কথা ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রচার করলেও পরিসংখ্যান কিন্তু উল্টো কথা বলে। পাট্টাদার ও বর্গাদাররা বেশির ভাগ লাভের অভাবে এবং প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ না পাওয়ার ফলে চাষ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়, এভাবে ২.৫ লক্ষ্য ছোট ভাগ চাষি কৃষিজোতের অধিকার থেকে উৎখাত হয়েছে। ২০০৪ সালের 'State institute of panchayat and rural development' এর সমীক্ষায় দেখা গেছে, পাট্টাদার ও বর্গাদাররা অর্ধেকের বেশি কৃষি খেতে সেচের জল পায় না বা তাদের খেতে জল সরবরাহ অপ্রতুল, তারা রাসায়নিক সার ও বীজ পায় না, তাদের ৯৫ শতাংশ কৃষি ঋণ সংগ্রহ করতে হয় মহাজনদের কাছ থেকে, ফলে ১৪.৩৭ শতাংশ বর্গাদার জমি থেকে উচ্ছেদ হয়েছে, ১২.৭৩ শতাংশ পর পাট্টাদার জমি হস্তান্তর করতে বাধ্য হয়েছেন। কাজেই ভূমিসংস্কার পর্ব শেষ বিচারে উল্টো মুখী যাত্রা গেছে বলে অনেকে মনে করেন। ২০০৪ সালের মানব উন্নয়ন রিপোর্ট বলেছে সারা ভারতে ভূমিহীনতার পরিমাণ যেখানে ৩৪ শতাংশ, পশ্চিমবঙ্গে তার পরিমাণ ৩৮ শতাংশ।[20]

[20] বামফ্রন্ট সরকার একটি পর্যালোচনা(খসড়া); ২৩-২৪ ফেব্রুয়ারী ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত ২৯ তম অধিবেশনে গৃহীত।

নৈরাজ্যবাদী পন্ডিতের মতে অপারেশন বর্গা রুপায়নের কল্যাণে গ্রামে কোনরূপ মৌলিক পরিবর্তন আসেনি; জোতদারদের ক্ষমতা অটুট, গ্রামে কোন বিকল্প ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। আধি ভাগ এখনও চালু বহু গ্রামে।

তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের প্রেক্ষাপটে অপারেশন বর্গাকে আলোচনা করলে সিপিআইএম এর অবস্থান নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়। পশ্চিমবঙ্গের ভূমি সংস্কার আইন- ১৯৭০, কে সংশোধন করে বর্গাদার কর্তৃক দেয় ফসলের হিস্যা ৭৫:২৫ অনুপাতে ভাগ করার বিষয়কে একটু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে শ্রেণীসংগ্রাম সংক্রান্ত ধারণার মধ্যে মার্কস যে বিষয়টিকে পুঁজিপতিদের বিকাশ ও শ্রেণী বৈষম্যের মূল কারণ বলে তুলে ধরেছেন, যে বিষয়টির ওপর ভিত্তি করে উৎপাদন প্রণালীতে উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদিকা সম্পর্কের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টির জন্য কারণ, এবং পুঁজির কেন্দ্রীভবনের জন্য যে 'উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্ব' বা 'Surplus Value' কে দায়ী করেছেন সিপিআইএম পরোক্ষভাবে ৭৫:২৫ অনুপাতের ভাগ কিন্তু SPV কেই কোন না কোন ভাবে সমর্থক হিসাবে পরিলক্ষিত হয়।অপারেশন বর্গার ফলে পুরাতন ভূমি সংস্কারের কোন গুণগত পরিবর্তন হয়নি। এই আইনে জমির মালিকের অধিকার পূর্ণমাত্রায় বজায় থাকে। কোন শ্রম না করে, উৎপাদনের কোন খরচ বা ঝুঁকি বহন না করে, জমির মালিক শুধু মালিক হবার সুবাদে উৎপাদনের ২৫% ভোগ করে। এই ব্যবস্থা পুঁজিপতি ব্যবস্থা থেকে পশ্চাৎপদ একটি ব্যবস্থা, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় জমির মালিককে সমগ্র উপাদানের তদারকি, উৎপাদন ব্যয় এবং ঝুঁকি বহন করতে হয়, কিন্তু বর্গাদার ব্যবস্থায় জমি মালিককে প্রায় সামন্তবাদী কায়দায় উদ্বৃত্ত আত্মসাতের অধিকার দেওয়া হয়। এই উদ্বৃত্ত উৎপাদনের পুনঃর্বিনিয়োগের কোন ইচ্ছা বা উৎপাদনের মানের উন্নয়ন ঘটাবার কোন দায় তার থাকে না।[21] চিরকাল মালিক বর্গাদার এর ঘাড়ের ওপর পরজীবীর মতো চেপে থাকে। ইদানিং আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তায় বাজার নির্ভর চাষের ঝুঁকি ক্রমশই বাড়ছে। জমির মালিক যে ব্যবস্থা ঝুঁকি থেকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি পায় তা ভাগচাষীর পক্ষে কখনই মঙ্গলজনক নয়। এই প্রসঙ্গে বর্তমানে বোর ধান চাষের লাভ ক্ষতির হিসাব দেওয়া হল-

[21] অজিত নারায়ণ বসু; পশ্চিম বাংলার কৃষি যা হয়ে চলেছে এবং যা হওয়া সম্ভব, অক্টোবর –নভেম্বর, ২০০১

উপাদান	**খরচ**
১. বীজ- ১০ কেজি	২৫০
২.বীজ তলায় তিন লাঙল (১ কাঠা) ট্রাক্টরে ৭ মিনিট	৭০
৩. সার ২০ কেজি	৬৫০
৪. জমিতে লাঙল –ট্রাক্টরে ৫০ মিনিট	৫০০
৫. সেচ(ডিজেল)	৯০০
৬. *শ্রমিক- ২ জন দিন	৬০০
৭. *নিড়ানী- ১৫ জন দিন	৪৫০০
৮. কীটনাশক- ২ কেজি	২৪০
মোট	**৭৭১০**

জমিতে খুব ভালো ফলন হলে বিঘা প্রতি ৮ কুইন্টাল ধান হবে। এর মধ্যে ভাগচাষীকে জমির মালিককে দিতে হবে ২ কুইন্টাল অর্থাৎ ভাগচাষী পাবে ৬ কুইন্টাল যার বাজার দর ১৪০০ টাকা/ কুইন্টাল অর্থাৎ টাকা হিসাবে ৮৪০০ টাকা। সমস্ত শ্রম যদি ভাগচাষির পারিবারিক শ্রম হয় তবে * চিহ্নিত খরচ গুলো বাদ যাবে এবং খরচ হবে বিঘা প্রতি ২৬১০ টাকা। অধিকাংশ ভাগচাষীরই চাষের থেকে যা আয় হয় তার সবটাই সংসার করো যে চলে যায়, তাই তাদের ধার করে ওই খরচ জোগাড় করতে হয়। মহাজনের কাছে ১২০ শতাংশ বাৎসরিক চার মাসের জন্য এই ২৬১০ টাকা ধার করলে সুদ লাগবে ১০৪৪ টাকা। ভাগচাষীর ভাগে ধান থাকবে ৬ কুইন্টাল যার বিক্রয় মূল্য ৮৭০০ টাকা, অর্থাৎ বর্গাদারের নিট লাভ ৮৭০০-৩৬৫৪=৫০৪৬। যদি বর্গাদার বছরে দু বার ফসল হয় এমন ৪ একর(১২ বিঘা) কোন ক্ষেতের ভাগচাষী হন তাহলে তার মাসিক রোজগার হবে ১০,০৯২ টাকা যা কোন কারখানার ঠিকা শ্রমিকের রোজগারের সমান। তফাৎ এই যে কারখানা ঠিকা শ্রমিকের এই রোজগার হয় একক শ্রমে আর বর্গাদারের পরিবারিক শ্রমে। পশ্চিমবঙ্গে তিন একরের বেশি বড় জোত এর পরিমাণ খুব কম এবং বর্তমানে জমিতে

বিঘাপ্রতি ৮ কুইন্টাল ধানের ফলন হওয়া বিরল ঘটনা। গড় ফলন ৬-৭ কুইন্টাল এর বেশি হয় না। এর থেকে বোঝা যায় একজন বর্গাদার কী অবস্থার মধ্যে জীবন-যাপন করেন। মহাজনের ঋণের বোঝা ও চাষের সমস্ত ঝুঁকি মাথায় নিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রাণপণ পরিশ্রম করা ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকে না।

অপারেশন বর্গা এর ফলে উৎপাদন বেড়েছে। কিন্তু পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদরা শুধু উপাদান বৃদ্ধিই দেখেন, উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পুনরুৎপাদনের দায়িত্বটা উৎপাদকের উপরে ছেড়ে দেন। এই নির্মম পদ্ধতির এতোটুকু শৈথিল্য বর্গাদারী ব্যবস্থা নেই যা মার্কসের বর্ণিত পুঁজিবাদী সমাজে কারখানায় নিয়োজিত শ্রমিকদের শ্রম বিনিময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বেতনের ধারণার সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। যেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন- মালিক শ্রেণী, শ্রমিকশ্রেণীর 'শ্রম'কে উৎপাদনের উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করে এবং উৎপাদিত দ্রব্য থেকে যে লভাংশ তৈরি হয় তার পুরোটাই মালিক শ্রেণী আত্মসাৎ করে যা বর্গাদারী ব্যবস্থাতেও পরিলক্ষিত হয়। ফলে আপাতদৃষ্টিতে অপারেশন বর্গা রাজনৈতিক ভাবে সাফল্য মূলক কর্মসূচি বলে মনে হলেও মতাদর্শগত দিক থেকে মার্কসবাদের থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে, অন্যথায় বলা চলে তাত্ত্বিক দিক থেকে সম্পূর্ণ বিপরীতে অবস্থান করে।

অপারেশন বর্গা এর মধ্য দিয়ে বড় বড় জমি গুলি ছোট ছোট জমিতে রূপান্তরিত হয়েছে। যার ফলে বর্তমানে নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে চাষাবাদ করা সম্ভব নয়, ফলে একদিকে যেমন খরচ বাড়ছে কিন্তু লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি নাও পাওয়ার জন্য সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। ফলে 'class in itself' এর অবস্থান থাকলেও তার পরিবর্তন হয়ে 'class for itself' এ উত্তীর্ণ হতে পারেনি। The Poverty of Philosophy বইতে মার্কস প্রলেতারিয়েতকে নিজেই একটি শ্রেণি(Class in it self), নিজের জন্য একটি শ্রেণীতে(Class for itself) বিভক্ত করে গেছেন। এই দুটি পদ নিয়ে মার্কসবাদীরা এযাবৎকাল বিস্তর আলোচনা করেছেন। বিতর্কও সৃষ্টি হয়েছে, এদের মধ্যে কি জাতীয় পার্থক্য বিদ্যমান তা আলোচনা প্রয়োজন। কেবল শ্রমিক হিসেবে কল কারখানায় কাজ করলে প্রলেতারিয়েত হওয়া যায় না। প্রাসঙ্গিকতা রক্ষার জন্য বলা প্রয়োজন যে শ্রেণী পদবাচ্য হতে গেলে প্রলেতারিয়েতদের কে একটি 'অভিন্ন ইস্যু' বা 'স্বার্থ' নিয়ে

বিরোধী শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। সংগ্রাম পরিচালনার প্রেক্ষাপট অবশ্যই থাকবে। প্রলেতারিয়েতের সংস্কৃতি স্বার্থ ইত্যাদি সবকিছুই অন্য শ্রেণি বিশেষ করে বুর্জোয়া শ্রেণী থেকে আলাদা হবে। স্বার্থ ও সংস্কৃতি আলাদা এটা চিন্তা করার পর প্রলেতারিয়েতরা বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে এবং এটি হবে রাজনৈতিক সংগ্রাম। মার্কস বলেছেন এই সংগ্রাম (যা রাজনৈতিক সংগ্রাম বলে কথিত) যত সময় পর্যন্ত দেখা না দিচ্ছে ততো সময় পর্যন্ত প্রলেতারিয়েতরা নিজের জন্য একটি শ্রেণী হিসেবে মর্যাদার অধিকারী হতে পারছে না। কিন্তু তাই বলে প্রলেতারিয়েতকে নিজে একটি শ্রেণি এই আখ্যায় ভূষিত করতে কোন বাধা থাকার কথা নয়। কারণ প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়া এরা পরস্পর বিরোধী শ্রেণি। পুঁজিপতিদের পরাজিত করতে হলে প্রলেতারিয়েতকে অতি অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে যদি প্রলেতারিয়েতরা ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম চালাতে না পারে তাহলে শ্রেণীর মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হবে। মার্কসের ধারণায় বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হয়ে সংগ্রাম চালাবার উপযুক্ততা অর্জন শ্রেণীর মর্যাদার উন্নতি করবে। সংগ্রাম পরিচালনার ক্ষমতা অর্জন করতে না পারলে প্রলেতারিয়েত সাধারণ মানুষ হিসেবে থেকে যাবে এবং নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকবে। যার ফল স্বরূপ সমাজে সিপিআইএম মার্কসীয় মতাদর্শকে সেই অর্থে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি।

*****

চতুর্থ অধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের ১৯৯০ এর পর অর্থনৈতিক কৃষি নীতি ও বিশ্বায়ন

৪.১ অর্থনৈতিক কৃষি নীতির ধারণা

৪.২ অর্থনৈতিক কৃষি নীতি প্রয়োগে সমস্যা

৪.৩ কৃষি নীতির পরিপ্রেক্ষিতে সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের জমি অধিগ্রহন

চতুর্থ অধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের ১৯৯০ এর পর নয়া কৃষি নীতি ও বিশ্বায়ন

কেন্দ্রীয় সরকার ৯০ দশকের একেবারে গোড়ার দিকে আর্থিক সংস্কার নীতি পুরোপুরি ভাবে চালু করে। যদিও আশির দশক থেকেই এর প্রাথমিক পদক্ষেপ গুলি শুরু হয়েছিল। প্রয়াত রাজীব গান্ধীর প্রধানমন্ত্রীত্ব কালে আর্থিক ক্ষেত্রে এমন কতগুলি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় যার ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যের ঘাটতি, বৈদেশিক মুদ্রা ভান্ডারে তীব্র সংকট দেখা দেয়। কেন্দ্রীয় সরকার এই পরিস্থিতির মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভান্ডার এবং বিশ্বব্যাংকের দ্বারস্থ হয়, তাদেরই সুপারিশ ক্রমে তথাকথিত আর্থিক উদারনীতি গৃহীত হয়। ভারতীয় মুদ্রার অবমূল্যায়ন ঘটানো হয়, আমদানি রপ্তানি নীতি ক্রমশ শিথিল করা হতে থাকে, সরকারি ব্যয় সংকোচনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভর্তুকি কমিয়ে আনার সিদ্ধান্ত হয়। সামাজিক ক্ষেত্রে সরকারি ব্যয় হ্রাস পেতে থাকে, দেশের সামগ্রিক আর্থিক বিকাশে এই নীতির তীব্র প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। এই নীতি গৃহীত হবার পর মাঝের দু-একটি বছর বাদে দেশের সামগ্রিক আর্থিক অগ্রগতির হার প্রত্যাশা অনুযায়ী ধরে রাখা যায়নি শিল্প ও কৃষি উভয় ক্ষেত্রেই শ্লথগতির প্রভাব পড়তে থাকে।

পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসেই ভূমিসংস্কারের কাজে হাত দেয়, ন্যাশনাল সিম্পেল সার্ভিসের ডাটা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৬০ শতাংশ জমি ক্ষুদ্র ও মাঝারি চাষীদের দখলে আসে এই ভূমিসংস্কার এর মধ্যে দিয়ে, যেখানে জাতীয় স্তরে ক্ষুদ্র ও মাঝারি চাষীদের

মালিকানাধীন জমি ২৮.৮%। ভূমিসংস্কারকে একদম সঠিকভাবে প্রয়োগ করার জন্য বামফ্রন্ট সরকার যেমন 'অপারেশন বর্গা' নামক ধারণা নিয়ে আসেন ঠিক তেমনি ভূমিসংস্কার পদক্ষেপ গুলিকে কার্যকর করতে তার উপাদান যেমন সেচ, যন্ত্রপাতি, সার এবং বিশেষ করে ঋণ ও বিপণনের ক্ষেত্রে কাঠামোগত সুবিধা প্রদানের মধ্যে দিয়ে প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে রাজ্যের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছিল. ১৯৭৬-৭৭ সালের ৭৫ লক্ষ টন থেকে ১৯৮৭-৮৮ সালে ১০৩ লক্ষ টন এবং ১৯৮৮-৮৯ সালে প্রত্যাশা মতো সর্বকালের রেকর্ড ১০৯ লক্ষ টন হয়ে যায়. যার ফল স্বরূপ বলা যায় বামফ্রন্ট সরকারের অন্যতম প্রধান সাফল্যই ছিল কৃষি ক্ষেত্রে.[1] কংগ্রেস আমলে পশ্চিমবঙ্গ খাদ্যশস্য উৎপাদনে ঘাটতি রাজ্য ছিল, স্বাধীনতার পর থেকে প্রতি বছর খাদ্যের দাবিতে রাস্তায় নেমে আন্দোলন করতে মানুষ বাধ্য হতেন, বামফ্রন্ট সরকারের আমলে পশ্চিমবঙ্গ খাদ্যশস্য উৎপাদনে উদ্বৃত্ত রাজ্যে পরিণত হয়। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের এই কৃষি উন্নতির সাফল্যের নিরিখে বলা যায় ১৯৭৭-৭৮ সালের তুলনায় প্রায় ৯৮ শতাংশ বেশি পরিমাণ চাল উৎপাদিত হয় এই রাজ্যে। দেশের মোট খাদ্যশস্য ৮ শতাংশ উৎপাদন হয় এ রাজ্যে যদিও দেশের মোট কৃষি জমির মাত্র ৩ শতাংশ রয়েছে আমাদের রাজ্যে। কৃষিতে উন্নয়নের অন্যতম প্রধান সূচক শস্য চাষের নিবিড়তা অর্থাৎ সেচের প্রসার ও জলের সংরক্ষণ ও সদব্যবহারের মাধ্যমে একই জমিতে একাধিকবার ফসল চাষ সম্ভব হয়, এক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ দেশের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে পৌঁছে ছিল, ১৯৯২-৯৩ সালে রাজ্যে শস্য চাষের নিবিড়তা ছিল ১৫৫ শতাংশ।[2] যার পরিপেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের কৃষিতে বৈচিত্র যথেষ্ট বেড়েছিল, কৃষকের আয় বাড়াতে সেই বৈচিত্রের মধ্যে এই সরকারের আমলেই সবজি উৎপাদনে দেশের প্রথম স্থানে পৌঁছে গিয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ আলু

[1] জ্যোতিঃ বসুর নির্বাচিত রচনা সংগ্রহ ; ভূমি সংস্কারই পঞ্চায়েতের অগ্রগতির ভিত্তি, ১৯৮৯ সালের ৩ এপ্রিল প্রদত্ত ভাষণ।

[2] বামফ্রন্ট সরকার একটি পর্যালোচনা(খসড়া); ২৩-২৪ ফেব্রুয়ারী ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত ২৯ তম অধিবেশনে গৃহীত।

উৎপাদন দেশের মধ্যে দ্বিতীয়তে ছিল, দেশের প্রায় ৩৫ শতাংশ আলু এ রাজ্য উৎপাদিত হতো, সবজি ও ফল উৎপাদনেও পশ্চিমবঙ্গ সামনের দিকে চলে আসে- দেশের মোট উৎপাদনের ১৫ শতাংশই পশ্চিমবঙ্গে হতো। আনারস, লিচু ও আমের উৎপাদনে দেশের মধ্যে যথাক্রমে প্রথম দ্বিতীয় ও অষ্টম স্থানে ছিল পশ্চিমবঙ্গ।[3] পাশাপাশি সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছিল কারণ কৃষকের গড় মজুরির হার ১৯৭৬-৭৭ সালের ৫.৬০ টাকা থেকে ১৯৮৭-৮৮ সালে ১৬ টাকার বেশি হয়,কিছু জেলার মজুরীর হার ২৫ টাকা ছাড়িয়ে যায়, অর্থাৎ ভূমিসংস্কার এবং শ্রমিক নির্ভর প্রযুক্তির ভিত্তিতে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে এবং ক্ষুদ্র শিল্পেরও বিকাশ হয়েছে যা কৃষির সঙ্গে জড়িত ও ঘন ব্যবহার্য দ্রব্য উৎপন্ন করে।

উপরের পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে মনে হবে যে ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ কৃষি শিল্পের ক্ষেত্রে অগ্রগতির ক্ষেত্র ছিল ঊর্ধ্বমুখী কিন্তু এই অগ্রগতি ছিল মাত্র এক দশকের জন্য কারণ, কৃষি উন্নয়নের শতাংশের সঙ্গে নিশ্চুপেই পাল্লা দিয়ে বাড়ছিলো গ্রামাঞ্চলে জনসংখ্যার শতাংশ, যার ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই এই সাফল্য অন্য দিকে মোড় নিতে শুরু করে, এমনিতেই গ্রামাঞ্চলের মধ্যে প্রথম থেকেই অবস্থান করতো ‘মরসুম’ বেকারত্ব অর্থাৎ কৃষি রোপন ও কর্তন ছাড়া সারা বছর আর কোন কাজ থাকে না হাতে, তার সাথে সাথেই গ্রামবাংলায় আরো এক ধরনের বেকারত্বের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় যাকে বলা হচ্ছে অর্থনীতির ভাষায় ‘প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব’ অর্থাৎ ‘বর্গা’ ব্যবস্থার পরবর্তী সময়ে যে পরিবার নির্দিষ্ট একটি জমিতে নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসল ফলাচ্ছিল সেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় পুরো পারিবারিক জনসংখ্যা স্বাভাবিকভাবেই সেই একই জমিতে ফসল ফলানোর কাজে যুক্ত হচ্ছিল। যার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রম এর পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও সেই

[3] জ্যোতিঃ বসুর নির্বাচিত রচনা সংগ্রহ ; চতুথ খণ্ড, পৃঃ ১৯১

একই অনুপাতে উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছিল না, যার ফলে লভ্যাংশ ও অতীতের থেকে বেশি হচ্ছিল না, অপরদিকে জমির পরিমাণ যেমন ছোট হচ্ছিল ঠিক তেমনি মাথাপিছু উৎপাদনশীলতার পরিমাণ কম হচ্ছিল, এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় শ্রী জ্যোতি বসু ১৯৮৪-৮৫ সালে কৃষিভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কথা বলেছিলেন. ঠিক তার কয়েক বছরের মধ্যেই দেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নরসিংহ রাও ১৯৯১ সালের জুন মাসে অর্থনৈতিক সংস্কারের অজুহাতে দেশে উদার অর্থনীতি চালু করেন।[4] ১৯৯১ সালে ভারতে নয়া অর্থনীতি কর্মসূচি গ্রহণ করে, ভারতকে বিশ্ব বাজারের সঙ্গে যুক্ত করে প্রতিযোগিতার পরিবেশ গড়ে তোলা এবং বেসরকারী উদ্যোগকে বাজার ব্যবস্থার সুবিধা দিয়ে উন্নয়নে ভূমিকা পালন করতে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে কাঠামোগত অভিযোজন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। বামফ্রন্ট সরকার মুখে এই আর্থিক নীতির তীব্র বিরোধিতা করলেও বাস্তবে এই নীতির কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং তিন বছরের মধ্যেই এই নীতির প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তারা তাদের উদ্দেশ্যগত ক্ষেত্রে দিকে পরিবর্তন ঘটানোর চেষ্টা করে।

২০০২ সালের ১৩ই জুলাই প্রমোদ দাশগুপ্ত স্মারক বক্তৃতায় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলেন,- ‘আমাদের মৌলিক লক্ষ্যকে সামনে রেখেই আমাদের এই ধরনের সরকার গড়ার সুযোগ এলে আমরা তা করবো, মানুষকে কিছু রিলিফ দিতে পারলে আমরা রিলিফ দেব, কিন্তু মনে রাখতে হবে এটা কোন মৌলিক সমস্যার সমাধান করতে পারবে না এবং নিরন্তন মূল লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া হবে আমাদের কাজ’। এখানে দুটো কথা বলা হচ্ছে প্রথমটা ‘রিলিফ দেওয়া’ আর দ্বিতীয়টি হলো ‘মূল লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া’ আমাদের বোঝা প্রয়োজন কিভাবে মূল লক্ষ্যকে বাতিল

[4] জ্যোতিঃ বসুর নির্বাচিত রচনা সংগ্রহ ; পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ২১-২২

করে দেওয়া হয়েছে, আর রিলিফ দেওয়ার কর্তব্যটি পরিবর্তিত হয়েছে, চালু শোষণমূলক ব্যবস্থায় যে কোন মূল্যে দীর্ঘস্থায়ী ভাবে সরকার চালানোর এক ও একমাত্র ভূমিকায় সেই লক্ষ্যে ১৯৯৪ সাল থেকে শুরু হয়েছে নয়া শিল্পনীতি-কৃষিনীতি-স্বাস্থ্যনীতি-শিক্ষানীতি প্রভৃতি, নতুন নীতি বানানোর কাজে CPIM নয়া আর্থিক নীতি নয়া উদারনীতি সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের যুগে নিজেদের যুগোপযোগী করে তোলে নিজেদের সীমিত ক্ষমতাকে বিদেশি বৃহৎ পুঁজিপতিদের মুনাফার স্বার্থে পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার করে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করল সিপিআইএম। ২০০০ সালে অনুষ্ঠিত তিরুবন্তপুরম বিশেষ পার্টি সম্মেলনে সর্বসম্মতভাবে ১১২ নম্বর ধারাকে সংশোধন করা হয়, নতুন ধারার নাম হলো ৭.৭ তাতে বলা হলো জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সরকার গঠনের কর্তব্যকে সামনে রেখেও যদি পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে জনগণের সমস্যাবলী প্রশ্নের এক কর্মসূচিতে অঙ্গীকারবদ্ধ কোন সরকার প্রতিষ্ঠার সুযোগ তাহলে পার্টি তেমন সুযোগের সদ্ব্যবহার করবে ও বর্তমান সীমাবদ্ধতার মধ্যে বিকল্প নীতিগুলোকে তুলে ধরার ও প্রয়োগ করার চেষ্টা করবে।

আরো উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো কর্মসূচির ১১৩ নম্বর[5] ধারাটি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করা হয়, ১৯৯২ সাল থেকেই কর্মসূচিকে যুগোপযোগী করে তোলার দাবি উঠেছিল সিপিআইএমের নেতৃত্বে এর মধ্য থেকেই। সিপিআইএম নেতা নিরুপম সেনের কলমে আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাদের চলার পথ- সপ্তম কংগ্রেসে গৃহীত কর্মসূচিতে যেখানে 'আশু রিলিফ' এর কথা বলা হয়েছিল তার পরিবর্তন ঘটিয়ে বর্তমান কর্মসূচিতে সমস্যাবলী প্রশ্নের লক্ষ্যে সীমাবদ্ধতার মধ্যেও একটি 'বিকল্প নীতি' তুলে ধরা ও প্রয়োগ করার কথা বলা হয়েছে। এই পরিবর্তনের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য উপলব্ধি করা দরকার এর অর্থ দাঁড়ালো- এখন থেকে আর অঙ্গরাজ্যে রিলিফ দেওয়ার সরকার গড়া নয়,

[5] প্রতিবেদনঃ মেকি বামপন্থীদের হাত থেকে লাল ঝাণ্ডা কেড়ে নিন, শোষণ মুক্তির দিশারী, বামপন্থাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করুন, পৃঃ ৩-৬

সমস্যাবলী প্রশমনের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকারে যাওয়ার চেষ্টা করা হবে। অবশ্য নয়া কর্মসূচিতেও এ কারাত সাহেবরা জুড়েছেন যে 'জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সরকার স্থাপনের কর্তব্যকে সামনে অবিচল রেখেও'। কিন্তু কিভাবে যে অবিচল রইল সেটা ৪৭ বছরে বোঝা গেল না সিপিআইএম বিপ্লবী বামপন্থাকে পরিত্যাগ করে সরকারি বামপন্থায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার যে বৃত্তটি ১৯৬৭ সালে রচনা করা শুরু করেছিল তা ২০০০ সালের এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হলো বলে অনেকে মনে করেন।[6]ফলতঃ গত ১০ বছরের সিপিআইএম-এর চলার মধ্যে কোন সংশয় ছিল না, বর্তমান শোষণমূলক ব্যবস্থায় তাদের পরিচালিত সরকারের বিকল্প কর্মসূচি যেকোন ভাবেই সমাজতান্ত্রিক হতে পারে না বরং তা যে ধনতান্ত্রিক নিয়ম মেনেই চলবে একথা সিপিআইএমের তাত্ত্বিক নেতারাই বারংবার বলেছেন। মনে রাখা প্রয়োজন ১৯৯১ সালে মনমোহন সিংহের উদ্যোগে এদেশের নয় অর্থনৈতিক নীতি চালু হয়। ১৯৯২ সালে সি পি আই এম এ আলোচনা শুরু হয়ে যায় বর্তমান শোষণমূলক ব্যবস্থায় শুধু রাজ্য সরকার নয় কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করতে হবে, ১৯৯৪ সালে পশ্চিমবঙ্গে বিকল্প শিল্প নীতির নামে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে বেসরকারি বিনিয়োগকে স্বাগত জানানো হয়েছিল এ রাজ্যে. ১৯৯৭ সালে এ রাজ্যের শিল্প পুনঃ গঠন সম্পর্কে মতামতের জন্য মার্কিন বহুজাতিক সংস্থা ম্যাকিন্সেকে তারা দায়িত্ব দিয়েছিল। তাদের পরামর্শ অনুযায়ী শিল্পের শ্রমিক সংখ্যা কমানোর জন্য কারখানায় কারখানায় জোর করে ভি আর এস করাতে সিটু পার্টি সবাই মিলে নেমেছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সরকারি সংস্থা ডি এফ আইডি থেকে ঋণ নেওয়া হয়েছে, রাজ্য সরকার পরিচালিত কারখানাগুলোকে কার্যত তুলে দেওয়ার জন্য সেই টাকায় শ্রমিক কর্মচারীদের ভি আর এস করানো হয়েছে। ২০০২ সালে আবারো মাকিন্সকে

[6] জ্যোতিঃ বসুর নির্বাচিত রচনা সংগ্রহ ; পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ২১-২২

দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল রাজ্যের কৃষি ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটানোর প্রস্তাব দেওয়ার জন্য। তাদের পরামর্শেই দেশি-বিদেশি বৃহৎ পুঁজি মুনাফার স্বার্থে প্রচলিত খাদ্যশস্যের বদলে অর্থকরী ফসলের চাষ, চুক্তি চাষ, কর্পোরেট চাষ ইত্যাদি সহ নয়া কৃষিনীতি চালু করে সিপিআইএম বুঝিয়ে দিয়েছিল নিজেদের স্বরূপ।[7]

১৯৯৪ সালের ১৮ই অক্টোবর 'পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়ন' প্রসঙ্গে ভাষণ দেওয়ার সময় জ্যোতি বসু বলেন-'১৯৯১ থেকে নতুন আর্থিক নীতি অঙ্গ হিসেবে ভারত সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। কিন্তু এই নীতি প্রবর্তন এর আগে দেশের অর্থনৈতিক অসুবিধাগুলির সুষ্ঠু বিশ্লেষণ করা হয়নি ও স্ব-নির্ভরতার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ভুল-ত্রুটি খতিয়ে দেখা হয়নি। উপরন্তু এর ফলে সম্পূর্ণ দেউলিয়া অবস্থা ও ঋণ পরিশোধ পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সঙ্কটের পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডার তথা বিশ্ব ব্যাংকের কাছে আমাদের দেশকে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে। এটাও আবার কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ব অনুসৃত নীতি গুলির জন্য হয়েছে। নতুন অর্থনৈতিক নীতির বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়ে আমরা আমাদের মতামত জানাই। আমি বিভিন্ন মঞ্চে এই নীতির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছি। নতুন অর্থনৈতিক নীতির ফলশ্রুতি হল লাইসেন্স প্রথার বিলোপ ও মাশুল সমীকরণ নীতি আংশিক প্রত্যাহার। এর সুবিধা আমরা গ্রহণ করছি যেহেতু শিল্পী অগ্রগতির ক্ষেত্রে এগুলি আমাদের সহায়ক হবে। আমরা আমার আশঙ্কা যে এই নতুন অর্থনৈতিক নীতির কতকগুলি দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের দেশের শিল্প বিকাশের সম্ভাবনায় ভবিষ্যৎ র বিরূপ প্রভাব ফেলবে। আমাদের প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে হবেই কিন্তু এই প্রতিযোগিতা সমান সমান হওয়া উচিত এবং তা অবশ্যই বহুজাতিক সংস্থা গুলোর সঙ্গে হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। আমরা অবশ্যই প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে

[7] উন্নততর বামফ্রন্টের সন্ধানে; বামফ্রন্টের কর্মসূচি ২০০১-০২ সালে বিধানসভার অর্থমন্ত্রীর বাজেট বিবৃতির অংশ বিশেষ

আমাদের পণ্য উৎপাদন করব অথচ এই প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা শ্রমিক স্বার্থ বাদ দিয়ে অর্জন করা বাঞ্ছনীয় নয়। তার কারণ এর ফলে বেকারি ও দারিদ্র্যের সমস্যা আরও বেড়ে যাবে। অন্যান্য দেশ সমাজ-গবেষণা ও উন্নয়ন এবং তাদের জনসম্পদ-সম্ভাবনা আহরণের মাধ্যমে সাফল্য অর্জন করেছে। এছাড়া নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দ্বারা আমাদের জনসাধারণের মাত্র ১৫ থেকে ২০ শতাংশ মানুষ উপকৃত হবেন এবং এতে সমস্যা আরও বাড়বে। উদারনীতি মানেই রাজ্যের অধিকার ও দায়িত্ব অস্বীকার করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কার্যকরীভাবে হস্তক্ষেপ করা। অথচ এই উন্নয়ন আমাদের জনসাধারণের বিশাল সংখ্যকের কাজে আসত এবং আমাদের শিল্প স্বার্থের সহায়ক হতো। আমরা প্রায়ই আমাদের শিল্পপতিদের কাছে শুনতে পাই যে- জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান প্রভৃতি দেশের ক্ষেত্রে এ ধরনের হস্তক্ষেপ এর নীতি গ্রহণ করা হয়। ভারত সরকারের নীতি মনে হয় এক্ষেত্রে পক্ষপাতপূর্ণ এবং বছর বছর ধরে গড়ে তোলা আমাদের শিল্প গুলির প্রতিকূলে কাজ করছে ও বিদেশি বহুজাতিক সংস্থাগুলির জন্য সুবিধাজনক হয়ে উঠছে।[৪]

শিল্প বিকাশ ও সমসাময়িক পরিস্থিতি সমস্ত দিক বিচার করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সম্প্রতি তার শিল্পনীতি ঘোষণা করেছে। পারস্পরিক সুবিধাজনক ও উপযুক্ত ক্ষেত্রে বিদেশি প্রযুক্তি ও বিনিয়োগ কে স্বাগত জানিয়েছি। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার ও যৌথ ক্ষেত্রকে দুর্বল বা প্রত্যাখ্যান না করে বেসরকারী উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। শিল্প ও সামাজিক পরিকাঠামোর উন্নতি সাধন ও উন্নতিকরণের উপর জোর দিতে হবে। দেশের দরজা বিদেশীদের কাছে পুরোপুরি উন্মুক্ত করে দেওয়া এবং বছর বছর ধরে আমাদের গড়ে তোলা শিল্প গুলির প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী শুল্ক হ্রাসের যে নীতি ভারত সরকার গ্রহণ করেছেন তাতে বিদেশি কোম্পানিগুলো একতরফাভাবে

[৪] জ্যোতিঃ বসুর নির্বাচিত রচনা সংগ্রহ ; পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ২১-২২

সুবিধা পাবে। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার এর বিরোধী কিন্তু জাপানি অর্থনীতিবিদ ডঃ সুবুরু ওকিতা ভারতের উদারনীতি প্রসঙ্গে বলেন, 'ধনতন্ত্রকে অনুসরণ করার প্রশ্নে সর্বাত্মক উদারীকরণ বাঞ্ছনীয় নাও হতে পারে। ভারতের ক্ষেত্রেও আগাম উদারনীতিকরণে ও সরকারের সমর্থনের অভাবে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় সমর্থ ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময় শিল্পগুলি বন্ধ হয়ে যেতে পারে। অতএব ভারতবর্ষ আরও নির্বাচনভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে উদারীকরণ নীতি থেকে উপকৃত হতে পারে। বিশেষ করে উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনাময় ও প্রতিযোগিতামুলক শিল্পগুলিতে এই দৃষ্টি ভঙ্গী প্রয়োজন। ঝটিকা উদারনীতিকরণের থেকে ধাপে ধাপে নির্বাচনভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এই নীতি গ্রহণ অধিকতর কার্যকরী। কখনও কখনও আমেরিকান অর্থনীতিবিদগণ এক ধাক্কায় উদারনীতিকরণের সুপারিশ করেন কিন্তু এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহনের জন্য চড়া সামাজিক ও রাজনৈতিক মুল্য দিতে হতে পারে'।

কেন্দ্র সরকার যখন কেন্দ্রে নতুন অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করছেন তখন পশ্চিমবঙ্গে ষষ্ঠবারের মত বামফ্রন্ট সরকার পুনর্নির্বাচিত হওয়ার পরই শুরু হয় এক নতুন অংক একটি দেশে সমাজতন্ত্র নির্মাণ আর তারই একটি অঙ্গরাজ্যে উত্তরণশীল সরকার পরিচালনার প্রয়াসতার .

পরিপ্রেক্ষিতেইমাননীয় বুদ্ধদেব বাবু নিয়ে আসেন 'উন্নয়নের শ্রেণীসংগ্রামের বামপন্থী ও নীল নকশা' নামক ধারণা[9]। প্রসারিত গণতন্ত্র সৃজনশীল কর্মকান্ড এবং উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ এর সফল পটভূমিকাতেই উঠে এসেছে 'উন্নততর বামফ্রন্টের' স্লোগান. এই ধারনার একটি মৌলিক বিষয় হিসেবে তুলে ধরা হয়েছিল- 'যে এটা বিপ্লবের অব্যাহতি পূর্বেকার কোন অতিকান্তিকালীন সরকার নয়, বর্তমান সীমাবদ্ধতার মধ্যে বিকল্প নীতি তুলে ধরা ও প্রয়োগ করার চেষ্টা করা এই

[9] উন্নততর বামফ্রন্টের সন্ধানে; বামফ্রন্টের কর্মসূচি ২০০১-০২ সালে বিধানসভার অর্থমন্ত্রীর বাজেট বিবৃতির অংশ বিশেষ

সরকারের ঘোষিত উদ্দেশ্য।[10] বামফ্রন্ট সরকার ঘোষণা করেছিল শ্রেণি ও সামাজিক বৈষম্য পীড়িত জনগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রকল্প গুলি সরকারি বিনিয়োগের প্রধান ক্ষেত্র হবে, খোলা বাজারে কেনার সামর্থ্য আছে জনগণের এ ধরনের অংশটির স্বার্থরক্ষাকারী প্রকল্পগুলির ক্ষেত্রে যৌথ উদ্যোগ ও বেসরকারি বিনিয়োগের উপর নির্ভর করতে হবে. বামফ্রন্ট সরকার মনে করে 'উন্নয়নের জন্য সংগ্রাম', শ্রেণীসংগ্রাম এরই অংশ. 'উন্নততর বামফ্রন্টের' কিছু কর্মসূচি প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বুদ্ধদেব বাবু, ভূমিসংস্কার বা গ্রামাঞ্চলে শ্রেণি সম্পর্কের পরিবর্তন নিয়ে কোন রকম ভনিতা না করে সোজা চলে এসেছেন ফলমূল শাক সবজি উৎপাদন বাড়ানোর-প্রশ্নে 'কৃষি' থেকে 'কৃষিভিত্তিক শিল্পের' রূপান্তর তার মতে এখন 'কৃষি অর্থনীতির' অগ্রগতির মূল চাবিকাঠি। আর এই পরিপ্রেক্ষিতেই বাংলার জনগণের জন্য উন্নত বামফ্রন্ট সরকারের বা আরো নির্দিষ্টভাবে সিপিএম নেতৃত্বের নতুন বার্তা- 'কৃষি আমাদের ভিত্তি, শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ'. 'কৃষি আমাদের ভিত্তি' স্লোগান শুনলে মনে হবে কৃষি প্রশ্নের সব ঠিকঠাক চলছে। এতকাল কৃষি প্রশ্ন শুরু হয়েছিল জমি ও ছোট কৃষক বা বর্গাচাষী থেকে, ভূমিসংস্কার, অপারেশন বর্গাই ছিল বামফ্রন্টের কিছু কর্মসূচির বহু চর্চিত ভিত্তি। আজকাল সরকারি তথ্য জানিয়ে দিচ্ছে কৃষক জমি হারাচ্ছে, নতুন করে উচ্ছেদ হচ্ছে। অথচ সরকারের সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই, ভাবখানা যেন ভূমিসংস্কার-কৃষিসংস্কারের কাজ পশ্চিমবাংলায় সম্পূর্ণ হয়ে বসে আছে, আর করনীয় কিছু নেই। আর এই হাব-ভাবের আড়ালে আসলে সরকার 'অন্য'রকমের ভূমি সংস্কার-কৃষি সংস্কারের পথে চলতে চায়। জমির উদ্দেশ্য বলতে গেলে তুলে দিয়ে জমির পুঁজিবাদী কেন্দ্রীভবনের রাস্তা সরকার প্রশস্ত করতে চায়- বর্গাদার ও ছোট কৃষকের

[10] দেশব্রতী; বিশেষ সংখ্যা; ফেব্রুয়ারি ২০১০

হাত থেকে জমি কেড়ে বা কম দামে কিনে নিয়ে তুলে দিতে চাই 'কর্পোরেট কৃষকের' হাতে। নতুন যুগের নতুন মন্ত্র – কর্পোরেট কৃষি ও চুক্তি চাষ।

আবার 'শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ' স্লোগানে শিল্প ব্যাপারটি হঠাৎই অতীত, বর্তমান ডিঙিয়ে পশ্চিমবাংলায় ভবিষ্যতের গর্ভে পৌঁছে গিয়েছে। কিন্তু বাস্তবের দিকে তাকালে চা শিল্প, চট শিল্প, কাগজ শিল্প, রাবার শিল্প, ইস্পাত শিল্প, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, মোটর গাড়ি নির্মাণ শিল্প পশ্চিমবাংলার মানচিত্র জুড়ে ছড়িয়ে থাকা এই শিল্পগুলোর বয়স নয় নয় করে ৫০ বছর থেকে শুরু করে ১০০ বছর বা তারও বেশি। এই শিল্পগুলোর বেশ কয়েকটি আজ সংকটে, কিছুটা পরিকাঠামোগত কারণে আর কিছুটা আন্তর্জাতিক বাজার ও বিকল্প শিল্পের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দীতায়। ফলে অনেকটাই কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের শিল্পনীতির কারণে. এই সংকট ও তার সমাধানের প্রশ্নটিকে এড়িয়ে গিয়ে হঠাৎ 'শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ' বলে সোনালী স্বপ্ন দেখিয়েছিল বামফ্রন্ট সরকার।[৯] বামফ্রন্ট সরকারের আসল বক্তব্য ছিল আধুনিক যুগে কৃষি ও শিল্পের মধ্যে কোন চীনের প্রাচীর নেই, কৃষিতে যেমন শিল্পজাত উপকরণ ও উপাদানের ব্যবহার ক্রমেই বেড়ে চলেছে তেমনি কৃষিভিত্তিক শিল্পের জগৎ লাগাতার সম্প্রসারিত হচ্ছে। কৃষি এবং শিল্প উভয়ই হয়ে উঠেছে বেশি বেশি করে পুঁজি নির্ভর ও পুঁজি-নিবিড়। কৃষি হোক আর শিল্প হোক, সর্বত্রই বাজারের দাপট ও মুনাফার প্রতিযোগিতা, সর্বত্রই পুঁজি আর শ্রমের সহঅস্তিত্ব ও পারস্পরিক সংঘাত। এই সমীকরণের নিরিখেই একদা বহু প্রচারিত 'সংগ্রামের হাতিয়ার' এর পরিবর্তে সরকার আজ 'উন্নয়নের শ্রেণীসংগ্রামের নীলনকশার প্রতি আগ্রহশীল'আর এর পরিপ্রেক্ষিতেই বামফ্রন্ট সরকার সালিম . গ্রুপের হাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মতো উর্বর জমি সম্পূর্ণ কৃষি প্রধান জেলার ৫,১০০ একর জমি তুলে দেওয়ার সর্বনাশা প্রস্তাবের পিছনে এই নতুন পথের হাতছানি বলে মনে হয়। পুঁজির

আরাধনায় সিপিএম কাজে লাগিয়েছিল 'শ্রম' এর উপর তার দখলকে। শ্রমের উপর এই দখল নিয়ে সিপিএম এর দম্ভ কম নয়। শ্রম আর শ্রমিকের লড়াই ও অধিকারের পার্টি হিসেবে পুরনো প্রচার, সংগঠনের বিস্তীর্ণ জাল, অতীত আন্দোলনের প্রভাবের রেশ, থেকে সামান্য কিছু পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি, সংগঠন ছেড়ে বেরিয়ে গেলে হাতেনাতে উচিত শাস্তিদানের ধমক- সব মিলিয়ে কৃষি ও শিল্পে শ্রম শক্তির এক বড় অংশকে বহু বিক্ষোভ সত্ত্বেও সিপিএম দীর্ঘদিন ধরে রেখেছিল। আর এটাই ছিল সিপিএমের বাড়তি 'আত্মবিশ্বাস' বা অহংকারের উৎস।[11] আর এই অহংবোধের ওপর ভিত্তি করেই বামফ্রন্ট সরকার বন্ধ হয়ে যাওয়া শিল্পগুলোকে পুনরায় খোলার ব্যবস্থা না করে, সেই সমস্ত জায়গাগুলোতে নতুন নতুন শপিং মল করার নির্দেশ দেয়, এবং নীরবে উদারনীতিবাদের ধারণাকে আষ্টেপিষ্টে গ্রহণ করে, এবং তাদের সুবিধার্থে কৃষকদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ জমি অধিগ্রহণ করে, তাদের(কৃষক) সঙ্গে কোনো রকম আলোচনা না করে এমনকি যেখানে বছরে দুইবার চাষ করার মত জমি রয়েছে সেখানেও শিল্পের জন্য হাজার হাজার জমি অধিগ্রহণের দিকে পা বাড়ায় বামফ্রন্ট সরকার, যার প্রত্যক্ষ উদাহরণ হল ২০০৬ ও ২০০৭ সালের সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের জমি অধিগ্রহণ. আর এখানেই তুলে ধরা হয় পশ্চিমবঙ্গে সিপিএমের ভূমি সংস্কার, শিল্পায়ন ও উন্নয়নের নীতি কতখানি কৃষক ও জনগণ বিরোধী, শুধু তাই নয় মার্কসবাদ ও বামপন্থী নীতির পরিপন্থী নয়া উদারনীতি ও বিশ্বায়নের যুগে সিপিএম কিভাবে বামপন্থী নীতি থেকে সরে গেছে, বামপন্থী জনগণ বিশেষ করে কৃষক ও মেহনতী জনগণ থেকে সিপিএমের কিভাবে দূরে চলে গেছে তা বাস্তবতা দেখিয়ে দিয়েছে। জনগণ সিপিএমের জমি আত্মসাতের নীতিগুলো প্রত্যাখান করেছে। ২০০৬ সালে মুখ্যমন্ত্রী ও শিল্প মন্ত্রীর মুখে প্রায়ই শোনা গেছে 'উন্নয়ন ও

[11]আজকের দেশব্রতী বিশেষ সংখ্যা জানুয়ারি ২০০৬

শিল্পায়নের' গৃহীত প্রকল্প রূপায়ণ এর সামনে আর 'চলবে না, চলবে নাস্লোগান অগ্রগতি ও ' উন্নততর মার্কসবাদের বিরোধী! আর যারা গণতন্ত্র বামপন্থা কৃষকের অধিকারের প্রশ্ন তুলে ছিল তারা নাকি পিছিয়ে পড়া মার্কসবাদী! ফলে প্রকাশ্যে চলে আসে বামপন্থী রাজনীতির সংস্পর্শ থেকে সিপিআইএম অনেক দূরে অবস্থান করছে। তারা কৃষক শ্রেণী তথা প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর ধারণার তুলনায় তারা বুর্জোয়া শ্রেণীর দিকে অনেক বেশি পক্ষপাতিত্বের দিকে এগিয়ে গেছে. সিপিআইএম হয়তো মনে করেছিল- জনগণের সংগ্রামের রূপ ও পদ্ধতি তারা ঠিক করে দেবে আর জনগণ সেই পথে তাদের অধিকারের জন্য লড়াই করবে। এটা যে নাও হতে পারে, তা সিঙ্গুরনন্দীগ্রামের - কৃষক জনগণ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে এই শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল. ...৯০ দশকের শেষভাগে কৃষি অর্থনীতির বিবর্তনের ধারায় ক্ষেতমজুরদের সাথে জমির মালিকদের, গরীব কৃষকদের সাথে পুঁজির শক্তির নতুন নতুন দ্বন্দ্ব যেমন তীব্রতর হয়ে উঠছিল, তেমনি তার সাথে যুক্ত হয়ে গ্রাম অঞ্চলের শোষক জোটের মধ্যে খুবই ছোট আকারের ফাটল দেখা দিয়েছিল.ষাটের দশকের পুরনো জোরদার, মহাজন ও মজুতদারদের জোট আজ আর নেই। বামফ্রন্ট আমলে প্রথম দিকে কৃষকদের হাতে পুঁজি এবং চাষের অন্যান্য সুবিধা তুলে দেওয়ার জন্য ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন ধরনের কৃষি সমবায় গুলো গড়ে তোলা হয়। গরিব কৃষকরা এগুলো থেকে কিছু সুবিধা পেলেও বামফ্রন্ট সরকারের সদিচ্ছা ও নিয়ন্ত্রণের অভাবে এবং অবাধ পুঁজি চলাচলের অমোঘ নিয়মে সমবায় সমেত কৃষি ক্ষেত্রের পুঁজি ও অন্যান্য সমস্ত সুবিধা কেন্দ্রীভূত হয়েছে নতুন জোতদার হাতে। গ্রামীণ অর্থনীতি চলে গিয়েছিল জোরদার, কুলাক, সরকারি আমলা ও পার্টির বদ বাবুদের নিয়ন্ত্রণে, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে খাদ্যশস্যের ব্যবসার পরিমাণও বেড়েছে। জোতদার ও কুলাকদের একটা অংশ এই ব্যবসার দিকে ভালো পরিমাণে ঝুঁকেছিল এবং এদেরকে

কেন্দ্র করে স্থানীয় স্তরে এক বাণিজ্যিক পুঁজি গড়ে উঠেছিল। এদিকে কংগ্রেস আমল থেকে চলে আসা বৃহৎ বাণিজ্যিক পুঁজির স্বার্থ বামফ্রন্ট আমলেও কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি, বরং এই সরকার বৃহৎ বাণিজ্যিক পুঁজির সাথে আপোষ করেই চলেছে। বৃহৎ বাণিজ্যিক পুঁজির সাথে স্থানীয় বাণিজ্যিক পুঁজি দ্বন্দ্ব-বিরোধ ও প্রতিযোগিতা আছে এবং কৃষি অর্থনীতির বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় তা আরো বেড়ে উঠেছে। এছাড়াও আছে বাণিজ্যিক পুঁজির সাথে উৎপাদনশীল পুঁজির দ্বন্দ্ব- এই সমস্ত দ্বন্দ্ব বিরোধ মিলে এক জটিল পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছিল যা সামাল দেওয়ার ক্ষমতা সম্ভবত সিপিএম তথা বামফ্রন্ট হারিয়ে ফেলেছিল। যার উল্লেখযোগ্য বাস্তব উদাহরণ হল সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের কৃষক আন্দোলন সিপিআইএমের বিরুদ্ধে। বামফ্রন্ট সরকার তাদের অবস্থান তুলে ধরতে মন্তব্য করেন যে এটা পুরোপুরি অবাঞ্ছিত এবং যারা শিল্পায়ন ও পুনর্বাসন এর অদ্বিতীয় সিঙ্গুর মডেল নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন তারা হয় নির্বোধ উন্মাদ অথবা তাদের কোন দুরভিসন্ধি রয়েছে। সিপিআইএম পলিটব্যুরো ও কেন্দ্রীয় কমিটির কোন কোন সদস্য এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে জনগণের জমি ও জীবিকার অধিকার রক্ষার এই আন্দোলনে রয়েছে টাটা গোষ্ঠী কর্পোরেট প্রতিদ্বন্দ্বীরা। পশ্চিমবাংলায় বামফ্রন্ট সরকারের কাছে গোটা আন্দোলনটা অবশ্য শুধুই আইনশৃংখলার সমস্যার প্রশ্ন এবং সমস্ত শক্তি - দিয়ে রাষ্ট্রকে সেটার জন্যকাজ করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচায অত্যান্ত দম্ভের সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন কাউকে টাটার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে দেওয়া হবে না। ১৪৪ ধারা কে নজিরবিহীনভাবে সম্প্রসারিত করে সিঙ্গুরের সঙ্গে ক্ষীণতম সংযোগ রয়েছে এমন সমস্ত রাস্তা কে এবং যে সমস্ত মানুষের মুখে দুরভিসন্ধির ছাপ রয়েছে তাদের ওই ধারার আওতায় আনা হয়েছিল এবং এইভাবে সিঙ্গুরকে পশ্চিমবাংলার অন্যান্য এলাকা থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছিল কিন্তু সিপিআইএম বলেছিল যে তারা জমি অধিক গ্রহণের ক্ষেত্রে ভিন্নপথ অবলম্বন করবে, তারা উর্বর

কৃষি জমি অধিগ্রহণ করবে না। আর কোনো জমি অধিগ্রহণের আগে সে শুধু জমি আছে এমন কৃষকদেরই সম্মতি নেবে না, ভূমিহীন যে মজদুরদের জীবিকা ওই জমির উপর নির্ভরশীল তাদের সম্মতিও তারা নেবে। সিঙ্গুর এই দুটো প্রতিশ্রুতি কে শূন্যগর্ভ বলে প্রমাণ করেছে।

সিঙ্গুর নিয়ে সি পি আই এম এর সব থেকে বড় যে দাবি, তার কেন্দ্রে রয়েছে 'ক্ষতিপূরণের প্যাকেজ', তাদের মতে উৎখাত হওয়া মানুষদের জন্য এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা আর কিছু হতে পারে না এবং এই প্যাকেজ জীবিকার জন্য জমির উপর নির্ভরশীল মানুষদের প্রতি ও দায়িত্বশীল।[12] ক্ষতিপূরণের প্যাকেজ শুধুমাত্র জমির মালিক ও নথিভুক্ত বর্গাদারদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করেনি অধিভুক্ত বিষয়টি বিবেচনাধীন। ৪-১০ই ডিসেম্বর ২০০৬ এর পিপল ডেমোক্রেসির সম্পাদকীয় দিকে যদি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায়, তবে দেখা যাবে সেখানে ১২,০০০ জমির মালিক ও ভাগচাষী ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী। যে ক্ষতিপূরণের মোট পরিমাণ হলো ১৩০ কোটি টাকা। গড় মাথাপিছু পরিমাণ দাঁড়ায় ১০৮৩০০ টাকার সামান্য বেশি-এটা কখনোই সেই পরিমাণ নয় যেটা কে ব্যাংকে স্থায়ী আমানত হিসেবে রেখে দিলে তার থেকে সুদের আয় জমির আই এর ১০/১৫ গুণ বেশি হবে! বিনয় কুমারের এই দাবি বড় বড় অনুপস্থিত জমির মালিকদের ক্ষেত্রে কিছুটা সত্যি হতে পারে জমি থেকে যাদের বর্তমান আয়ের ভাগ চাষীর কাছ থেকে ,২৫ শতাংশ ভাগ পাওয়াতেই সীমিত. ছোট ও প্রান্তিক চাষী এবং তাদের অবস্থাটা তবে কেমন? অনুপস্থিত জমির মালিকের চেয়ে জমির সঙ্গে যে কৃষকের সম্পর্ক অনেক বেশি নিবিড় এবং ওই জমির উপর যিনি অনেক বেশি নির্ভরশীল তার ক্ষতিপূরণের ভাগ জমির মালিকের ক্ষতিপূরণের মাত্র ২৫ শতাংশ! অপারেশন বর্গা জমির মালিকের হাতে উৎখাত হওয়া থেকে ভাগচাষীকে বাঁচিয়ে ছিলো আর জমির

[12] দ্য হিন্দু পত্রিকা ডিসেম্বর ১৩, ২০০৬ দয়া করে শুধুই তথ্য গুলোর দিকে তাকান

মালিকের আয়কে বেঁধে দিয়েছিল উৎপাদিত ফসলের ২৫ শতাংশে. ক্ষতিপূরণের প্যাকেজ কিন্তু ঐ শর্ত কে পুরোপুরি উল্টে দিয়েছিল। রাষ্ট্র ভাগচাষীকে উৎখাত করছে আর তাকে দিচ্ছে জমির মালিককে দেওয়া ক্ষতিপূরণের মাত্র ২৫ শতাংশ. আর কৃষক যে প্রকৃতই মেহনত করছে যে কৃষি মজুর ফসল উৎপাদনে সব থেকে বেশি শ্রম দিচ্ছে তার দিক থেকে দেখলে দেখা যাবে সে আগের চেয়ে অনেক বেশি স্বাধীন হয়ে গেছে জমির সঙ্গে তার আগেকার জীবিকা গত সমস্ত সম্পর্ক থেকে তাকে মুক্ত করা হয়েছে, আর আজ তাকে কৃষিকাজের মজুরির বদলে সে এখন পাচ্ছে ভবিষ্যতে বিকল্প পথে কাজের প্রতিশ্রুতির সান্তনা! 'চাষ করে যে জমি তার' এই পুরনো স্লোগানটা অতএব হয়ে যাচ্ছে 'যে কিনছে জমি তার', ক্ষতিপূরণ পাবে অনুপস্থিত জমিদার, জমি থেকে 'উৎখাত' হওয়ার নামমাত্র বিদায়মূল্যে প্রকৃতই যে চাষ করে তার, আর মেহনতির শূন্যগর্ভ প্রতিশ্রুতির অধিকার। ফলে পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট সরকার নয়া উদারনীতিবাদী এজেন্ডার দিকে যত বেশি ঝুঁকেছে ততই গ্রামীণ দরিদ্র কৃষি শ্রমিক এবং বাংলার সংগঠিত ও অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে অসন্তোষ এর লক্ষণ গুলোকে বেড়ে উঠতে দেখা গেছে. এই মোহভঙ্গকে আমরা নির্বাচনের সময় ক্রোধে পরিণত হতে দেখেছি এবং পশ্চিমবাংলায় এক রাজনৈতিক শক্তি ও ধারা হিসেবে তৃণমূল কংগ্রেসের উত্থানের পেছনেও এর যথেষ্ট অবদান রয়েছে বলে মনে করা হয়। কংগ্রেসের সমর্থনভিত্তি এবং ওপরতলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটা অংশকে নিজের দিকে টেনে নিয়ে সি পি আই এম ধ্বসকে রুখতে সমর্থন হলেও তার পুরনো সমর্থন ভিত্তির বড় অংশের কাছে বামফ্রন্টের 'বাম' আবেদন অনেকটাই হারিয়ে ফেলে, যার প্রমাণ সিঙ্গুর থেকে বোঝা যায়। ছোট-মাঝারি চাষি এবং বর্গাদার দের থেকে বিচ্ছিন্নতার ধারাও শুরু হয়ে গিয়েছিল বামফ্রন্টের এটা

এমন এক বিচ্ছিন্নতা যার মধ্যে পশ্চিমবাংলায় সিপিআইএমের তিন দশকের শাসনের সাজানো বাগান তছনছ হয়ে গিয়েছিলআওয়াজ উঠেছিল বুদ্ধ টাটা ভাই ভাই,।[13]

সিঙ্গুর ঘটনার সাথে সাথেই সিপিআইএমের অবস্থানকে আরও একবার নাড়িয়ে দিয়েছিল যে ঘটনা তা হল নন্দীগ্রাম গণহত্যা, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার হলদিয়া শহরের নিকটস্থ নন্দীগ্রাম পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইন্দোনেশিয়ার 'সালেম গোষ্ঠীর' জন্য বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠন করার উদ্দেশ্যে ১০০০০ একর জমি অধিগ্রহণ করতে চাইলে স্থানীয় মানুষেরা প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু করেন এই আন্দোলন দমনের জন্য সরকার চার হাজারেরও বেশি সশস্ত্র পুলিশ একটি বাহিনী অঞ্চলে প্রেরণ করে ২০০৭ সালের ১৪ ই মার্চ পুলিশের সঙ্গে স্থানীয় গ্রামবাসীদের সঙ্গে পুলিশের গুলিতে ১৪ জন গ্রামবাসী নিহত হন[14].,[15]

নন্দীগ্রামে প্রস্তাবিত কেমিক্যাল হাব গড়ার বরাত পেয়েছিল সালেম গোষ্ঠী। ইন্দোনেশিয়ার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি সুহার্তোর ঘনিষ্ঠ সুদোনো সালেম ছিলেন এই গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা। প্রস্তাবিত কেমিক্যাল হাবটির জন্য প্রয়োজন ছিল ১৪,০০০ একর বা ৫৭ বর্গকিলোমিটার জমি। মোট ২৯টি মৌজা নিয়ে এই কেমিক্যাল হাব গড়ে ওঠার কথা ছিল। এর মধ্যে ২৭টি ছিল নন্দীগ্রামে।[16] ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিআইসাংসদ প্রবোধ পান্ডা জানিয়েছিলেন (, যে জমিটি অধিগৃহীত হতে চলেছে তা বহুফসলি জমি এবং সেই জমি অধিগৃহীত হলে চল্লিশ হাজারেরও বেশি মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হবে।[17] স্বাভাবিক কারণেই তাই জমি ও জীবিকা হারানোর ভয়ে এলাকার কৃষিজীবী

[13] দেশব্রতী বিশেষ সংখ্যা জানুয়ারি ২০০৬

[14] Asia week

[15] The Telegraph, 4 th January 2007

[16] The Stateman, 15th November 2006

[17] Sub Inspector killed in Nandigram: The Hindu February 08,2007

দরিদ্র মানুষ অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে একজোট হনএকাধিক উচ্চপর্যায়ের প্রকল্পের জন্য , সালিম গোষ্ঠীকে মোট ৩৫,০০০ একর ১৪০ বর্গ কিলোমিটার) জমি দেওয়ার কথা হয়।[18] পশ্চিমবঙ্গ শিল্পোন্নয়ন নিগমের সঙ্গে ৫০৫০ শেয়ারে যৌথ উদ্যোগে বিশেষ অর্থনৈতিক : অঞ্চল ছাড়াও একটি ১০০ কিলোমিটার দীর্ঘ ও ১০০ মিটার প্রশস্ত ইস্টার্ন লিঙ্ক এক্সপ্রেসওয়ে ও হলদিয়া ও নন্দীগ্রামকে সংযোগকারী হলদি নদীর উপর একটি চার লেনের সড়কসেতু নির্মানেরও পরিকল্পনাও গৃহীত হয়। প্রস্তাবিত সেতুটির হলদিয়া ও নন্দীগ্রামে প্রস্তাবিত সেজএর মধ্যে - হলদিয়ার সঙ্গে ৩৪ নং জাতীয় সড়ককে যুক্ত করার কথাও ছিল।

নন্দীগ্রামের গণহত্যাকে ধামাচাপা দেওয়ার যতই চেষ্টা করা হয়েছিল উত্তাল বাংলার গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা ছড়িয়ে গিয়েছিল সমাজ জীবনের বিস্তীর্ণ প্রান্তর জুড়ে উঠেছে বিতর্কের ঝড়, সেই ঝড়ে কেঁপে উঠেছে সিপিআইএমের শাসন ক্ষমতার সাজানো বাগান সমস্ত নিয়ন্ত্রণ চোখরাঙানিকে উপেক্ষা করে এগিয়ে চলেছে প্রতিবাদে ঢেউ.

ক্ষমতা কাঠামোর অদৃশ্য অঙ্গুলিহেলনে সিবিআই তদন্ত মাঝপথে থমকে দাঁড়ালেও এই বিতর্ক এবং প্রতিবাদকে সামাল দেওয়া সিপিএম নেতৃত্ব পক্ষে অসম্ভব প্রমাণিত হয়েছিল, শিল্পায়নের নামে নতুন করে বিভ্রান্তি ছড়াতে বন্দুকের পাশাপাশি কলম নিয়েও তাই আসরে নেমে পড়েছিলেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তাঁর ঘোষণা- 'শিল্পে উত্তরণের অভিমুখ হবে গরীব মানুষ'। এই প্রচার পুস্তিকাকে হাতিয়ার করে পার্টি সর্বস্তরের কর্মী ও নেতৃত্বের কাছে গ্রাম থেকে শহর ও শহরাঞ্চলের পাড়া পর্যন্ত

[18] Nandigram : Scare still 100ms Large.

[19] CPIM পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি প্রকাশিত 'মুখ্যমন্ত্রীর বইঃ আমাদের কথা' পৃঃ ৩-৫, মে ২০০৭

আলোচনা ও মতামতের ভিত্তিতে জোরদার প্রচার যুদ্ধে নেমে পড়ার আহ্বান জানিয়েছেন ছিলেন সিপিআইএমের রাজ্য সম্পাদক বিমান বসু।

হঠাৎ এই গরীব মানুষের কথাটা নতুন করে আবার বলতে হলো কেন? 'কৃষি আমাদের ভিত্তি, শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ' এই শ্লোগানের অভিমুখে গরিব মানুষকে কেন আবার টেনে হিঁচড়ে নিয়ে আসা? এতদিন কৃষি বনাম শিল্প আর ভেতরের লোক বনাম বাইরের লোকের গল্প শোনানোর পর হঠাৎ কেন গরিব মানুষের পাঁচালী গায়তে হয়েছিল? উত্তরটা খুব পরিষ্কার। গরিব মানুষ রুখে দাঁড়াতে শুরু করেছিল, আর সেই রুখে দাঁড়ানো গরিব মানুষের প্রতিবাদ প্রতিরোধের ধাক্কায় খসে পড়ছিল বহু পুরনো মুখোশ, ক্ষমতাসীন নেতৃত্বের পায়ের তলা থেকে সরে গিয়েছিল অনেক পুরনো মাটি। কিন্তু টাটা-সালিম এর পাশাপাশি গরিব মানুষের নাম নিতে গিয়ে এমন এক ধোঁয়াশা ও মিথ্যার জাল বুনতে হয়েছিল বুদ্ধ বাবুকে যে সেই জালে তিনি নিজেই আরো বেশি করে জড়িয়ে পড়েছিলেন।

গরীব মানুষের কথা বলতে গিয়ে বুদ্ধবাবু বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত ইতিহাসকে স্মরণ করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কি অদ্ভুত ব্যাপার ছিল- একবারও তার স্মরণে আসেনি তেভাগা আন্দোলনের কথা! সেই তেভাগার এক ঐতিহাসিক মঞ্চেই ঘটে চলছিল নন্দীগ্রাম- তেভাগার উত্তরাধিকারী গরিব কৃষক বর্গাদার ও ক্ষেতমজুর এরাই তো জীবন দিয়ে রুখে দিয়েছিল নন্দীগ্রামের কৃষিজমিতে সালেম এর জন্য বিশেষ আর্থিক অঞ্চল করার চক্রান্ত।

নিজেদের মতাদর্শগত অবস্থান সুনিশ্চিত করার জন্য বুদ্ধবাবু তার লেখা শেষের দিকে স্বীকার করেছেন- "জমির ব্যাপারটা খুব স্পর্শকাতর। সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম দুই জায়গাতেই আছে-অনথিভূক্ত

বর্গাদার, ক্ষেতমজুরদের ব্যাপারটা। আসলে গরিব মানুষ তারা। এই অংশের মানুষকে সঙ্গে নিতে হবে"। তাহলে এটা পরিষ্কার সিঙ্গুর নন্দীগ্রামের ব্যাপক বিক্ষোভের-মূলে অনথিভুক্ত বর্গাদার, ক্ষেতমজুর, গরিব মানুষ- আর তাদের এখনো পর্যন্ত সঙ্গে নিতে পারেনি বামফ্রন্ট সরকার ও তার তথাকথিত শিল্পায়ন ও উন্নয়ন। সিঙ্গুরের সরকারি ক্ষতিপূরণের গণিতে এই গরিবেরা আজও অনুপস্থিত- অথচ বুদ্ধবাবু বড় গলায় বলেছিলেন, "এই অংশের মানুষকে সঙ্গে নিতে না পারলে বামপন্থী সরকারের সঙ্গে মহারাষ্ট্র গুজরাট সরকার এর পার্থক্য কোথায়"? বুদ্ধবাবু দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তিনি লিখেছেন, "সিঙ্গুরনন্দীগ্রাম যেখানেই হোক-, দেখতে হবে চোখের জল যেন না পড়ে। এটাই বামপন্থী সরকারের দায়িত্ব হওয়া উচিত"। গণশক্তির পাতা উল্টালে দেখা যায় পুস্তিকা আকারে ২৩ শে মার্চ প্রকাশিত হলেও দীর্ঘ প্রবন্ধ হিসেবে লেখাটি গণশক্তিতে প্রকাশিত হয়েছিল মার্চ মাসের ৬ তারিখ সেখানে ভাষাটা একটু অন্যরকম ছিল. সাধারণ জনগণকে পাশে পাওয়ার জন্য বুদ্ধবাবু লিখেছেন, "যে যে প্রান্ত থেকে বিরোধীরা আসছে, আমাদের তত্ত্বগতভাবে, মতাদর্শের ভিত্তিতে, কর্মসূচির ভিত্তিতে আমাদের বামপন্থা সম্পর্কে মানুষকে বোঝাতে হবে, যার মূল কথাটা হচ্ছে আমাদের শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গিটা সরে না যায়। আমাদের শিল্পে উত্তরনের অভিমুখটা যে গরিব মানুষের জন্য তা ভালো ভাবে মানুষকে বোঝাতেই হবে"।[20]

*****

[20] Buddhadeb Ghosh: WHAT MADE THE Unwilling farmers unwilling? A note on singur :

উপসংহার

উপসংহার

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণার বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে একমাত্র আদিম সাম্যবাদী সমাজ ছাড়া সমাজ বিকাশের বিভিন্ন স্তরে সমাজ মোটামুটি দুটি পরস্পর বিরোধী শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। ম্যানিফেস্টো শুরু হয়েছে এই কথাগুলি দিয়ে- "The history of all hitherto existing societies is the history of class struggles" অর্থাৎ বিদ্যমান সমাজের ইতিহাস মানে শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস। অর্থাৎ সমাজ বিকাশের কোন স্তরই শ্রেণীসংগ্রাম থেকে মুক্ত ছিল না। এই কারণে সমাজ সম্পর্কে বস্তুবাদী ধারণা গড়ে তুলতে হলে যে সমস্ত শ্রেণি নিয়ে সমাজ গঠিত হয়েছে তাদের গঠন, চরিত্র এবং সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা অত্যাবশ্যক। এমন কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে মার্কসবাদ থেকে শ্রেণীসংগ্রাম বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না। যে বস্তুবাদী সমাজ নিয়ে মার্কস-এঙ্গেলস আলোচনা করে গেছেন তার সারবস্তু হল শ্রেণীসংগ্রাম। পরিশেষে মার্ক্স-এঙ্গেলস' যে সমাজের কল্পনা করেছিলেন তার আবির্ভাবও শ্রেণী সংগ্রাম থেকে। শ্রেণী এবং শ্রেণী সংগ্রাম মার্কসবাদে এত গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও মার্কস অথবা তার সারা জীবনের সহযোগী বন্ধু এঙ্গেলস এ বিষয়ে কোনো প্রণালীবদ্ধ আলোচনা করে যাননি, এটা রীতিমতো আশ্চর্যের বিষয়। 'ক্যাপিটাল' এর তৃতীয় খন্ডের ৮৬২ পৃষ্ঠায় শ্রেণী সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত করলেও শেষ করে যেতে পারেন নি। অর্থাৎ এখানে আমরা তার শ্রেণীর সম্পর্কিত কোন সংজ্ঞা পায় না। তিনি প্রশ্ন রেখেছেন- what constitutes the class? কিন্তু উত্তর হিসেবে তিনি যা দিয়েছেন তা একটা পাল্টা প্রশ্ন মাত্র। তিনি বলেছেন বুর্জোয়া রাষ্ট্রে তিন প্রকার শ্রেণী আছে- মজুরি শ্রমিক, পুঁজিপতি ও ভূস্বামী। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁকে বলতে দেখা গেছে যে পুঁজিবাদী সমাজের দ্রুত বিকাশের ফলে শ্রেণীবিন্যাস সরলীকরণ হয়ে গেল। অর্থাৎ বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েত এর মাঝে যে শ্রেণী গুলো ছিল তারা অকিঞ্চিৎকর হয়ে পড়ল। কিন্তু আলোচনা তিনি যাই করুন না কেন একে কোন অর্থে প্রণালীবদ্ধ বলা চলে না। The German Ideology এবং The Poverty of Philosophy গ্রন্থে শ্রেণি বিষয় বিক্ষিপ্ত আলোচনা আমরা পাই।

Kolakowski বলেছেন- Marx approached the question of classes from the standpoint of the condition in Britain. অর্থাৎ তাঁর সময়ে ব্রিটেনে সমাজ-ব্যবস্থা যে আকার ও অবস্থায় ছিল কেবল তারই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি শ্রেণীর সম্পর্কিত ধারণাটিকে বিশ্লেষণ করে গেছেন। অবশ্য এজন্য তাঁকে বিন্দুমাত্র দোষ দেওয়া যায় না। কারণ তাঁর সময়ে ব্রিটেনে পুঁজিবাদের সর্বাধিক বিকাশ সাধন ঘটেছিল এবং সেখানকার সমাজে দুই সংগ্রামরত শ্রেণীর অস্তিত্ব লক্ষ্য করেছিলেন। তাই ব্রিটেনকে বিশ্লেষণের মডেল হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছিলেন। তবে ব্রিটেনে দুটি প্রধান শ্রেণী যে সব সময় বিশুদ্ধ আকারে বিরাজ করত তা নয়। অর্থাৎ মার্কস-এঙ্গেলস আলোচনার মধ্যে দুই শ্রেণীর মডেলের কথা তুলে ধরেন। আর এখানেই প্রশ্ন ওঠে যে অন্যান্য শ্রেণীর অস্তিত্ব কি তারা স্বীকার করেন? অনেক বুর্জোয়া তাত্ত্বিক মার্কস-এঙ্গেলসের দুই শ্রেণীর মডেলের সমালোচনা করে বলেন যে তাঁরা এই দুই শ্রেণীর মধ্যবর্তী শ্রেণীর অস্তিত্ব স্বীকার না করে অবাস্তবতার পরিচয় দিয়ে গেছেন। কিন্তু এই অভিযোগ সবৈব মিথ্যা। অন্যান্য শ্রেণী সম্পর্কে মার্কস বিশেষভাবে অবহিত ছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে পাতিবুর্জোয়া, কৃষক প্রভৃতি শ্রেণীর উল্লেখের মধ্যে। জমিতে চাষ করে অথচ প্রলেতারিয়েত বা কৃষক কোনটাই নয় এমন এক শ্রেণীর উল্লেখ তাঁর আলোচনায় পাওয়া যায়। শুধু উল্লেখই নয় যদি কৃষক শ্রেণীর দৃষ্টিকোণ থেকে মাক্সবাদী আলোচনায় মার্কসের নিজস্ব লেখাকে সম্পূর্ণ ভাবে আলোচনা করা যায় তাহলে তার একটি পর্যায়ক্রমিক স্রোত পরিলক্ষিত হয় কৃষক শ্রেণীর উপর, যা এই গবেষণার প্রথম অধ্যায়ের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, এবং তুলে ধরা হয়েছে যে মার্কসবাদী আলোচনায় শ্রেণীসংগ্রামে কৃষক শ্রেণী একটি নির্দিষ্ট গুরুত্ব বা অবদান রয়েছে। এক্ষেত্রে তিনি দেখিয়েছেন 'বিপ্লবী স্পেন' নামক শীর্ষক প্রবন্ধে ১৮২০-২৩ সালের বুর্জোয়া বিপ্লব এর পরাজয় বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে মার্কস তুলে ধরেছেন- 'বিপ্লবী পার্টি শহরের আন্দোলনের সাথে কৃষক সম্প্রদায়ের স্বার্থের সংযোগ ঘটাতে পারেনি তাই এই পরাজয়'। এছাড়াও ১৮৬৩-৬৪ সালের পোলিশ অভ্যুত্থান প্রসঙ্গে মার্কস কৃষক শ্রেণীর গুরুত্ব তুলে ধরে বলেছেন- 'যখন কৃষি বিপ্লবের প্রসার ঘটবে জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম যখন গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সূত্রে আবদ্ধ হবে একমাত্র তখনই পোলদের স্বাধীনতা সংগ্রাম সাফল্যমণ্ডিত হবে।

মার্কসীয় মতাদর্শে বিশ্বাসী সি পি আই এম এর নেতৃত্বে বামফ্রন্ট জোট ভারতের সংসদীয় ব্যবস্থায় অংশগ্রহনের মধ্যে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে সরকারি ক্ষমতায় অবস্থান করার পরই তাদের প্রথম কর্মসূচি হিসাবে গ্রহণ করে ভূমিসংস্কার, এবং এই ভূমিসংস্কারকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য নিয়ে আসে 'অপারেশন বর্গা' নামক কর্মসূচি। এখানে স্পষ্ট ভাবে বলে দেওয়া হয় যে, জমির মালিক ও কৃষকের মধ্যে ফসলের আনুপাতিক হার হল ৭৫ঃ২৫, গবেষণা পত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে 'অপারেশন বর্গা'র সাফল্য হিসেবে পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭৯ সালের মধ্যে ৫,৭২,৬৯৪ বর্গাদার তাদের নাম নথিভুক্ত করেছিল যা ১৯৯০ সালে এসে ১৪,৫০,০০০ এ এসে দাঁড়ায়। ২০০৬ সালের World Development Report-এ বামফ্রন্ট সরকারের ভূমিসংস্কার কর্মসূচির সপ্রশংসা উল্লেখ করে। এবং ভূমিসংস্কারের ফলে পশ্চিমবঙ্গে ৩০ লক্ষাধিক কৃষক পেয়েছিল ১১ লক্ষ ২৭ হাজার একরের বেশি জমি। পাট্টা প্রাপকদের প্রায় ৩৭ শতাংশ তপশীল জাতি ভুক্ত, প্রায় ১৮ শতাংশ আদিবাসী এবং ১৮ শতাংশ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। নারী-পুরুষ যৌথ পাট্টা দেওয়া হয়েছিল ৬ লক্ষ ১৮ হাজারেরও বেশি। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ১৫ লক্ষ ১৩ হাজার নথিভুক্ত বর্গাদারের আইনি অধিকার সুরক্ষিত, বামফ্রন্ট সরকারের সময়কালে বর্গা জমির নথিভুক্তের পরিমাণ দাঁড়িয়ে ছিল প্রায় ১১ লক্ষ ১৫ হাজার একর। এছাড়াও ভূমিসংস্কারের ফলে পশ্চিমবঙ্গের ভূমি সম্পর্কে যে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছিল তা এই অধ্যায়ে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে এবং এই কর্মসূচিতে ভূমি ক্ষেত্রে সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর যে আঘাত হেনেছিল তা আলোচনা করা হয়েছে, এমনকি ভূমি সংস্কার বা 'অপারেশন বর্গা'র ফলে কৃষিতে যে প্রভূত সাফল্য পেয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ এবং ১৯৮০ র দশকে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির হারে পশ্চিমবঙ্গ সারা দেশে প্রথম স্থান অধিকার করেছিল তার সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে বিস্তারিত ভাবে, এর সাথে সাথেই 'অপারেশন বর্গা' রূপায়নের যে বিচ্যুতি ছিল সেগুলো তুলে ধরে 'অপারেশন বর্গা'কে তাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করা হয়েছে এবং দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে তত্ত্বগত দিক থেকে অবস্থানটা আসলে কি? 'অপারেশন বর্গা'র আনুপাতিক হার ৭৫ঃ২৫ কে দেখে আপাতদৃষ্টিতে কৃষক শ্রেণীর ক্ষেত্রে উপকারী নীতি হিসেবে মনে হলেও একটু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে তা উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্বেরই ছায়া বা প্রতিরূপ। কেননা উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দেখানো হয় যে, মালিক শ্রেণী কলকারখানা নির্মাণ করে এবং সেই কলকারখানাতে শ্রমের সরবরাহকারী হিসেবে

শ্রমিকশ্রেণীকে নিয়োগ করা হয় নির্দিষ্ট একটি চুক্তির মাধ্যমে, এখানে 'শ্রম'কে কাঁচামালের মতোই একটি পণ্য হিসেবে গণ্য করা হয়, যার সুবাদে উৎপাদন ব্যবস্থায়, উৎপাদিত দ্রব্যের উপর শ্রমিক শ্রেণীর আলাদা করে কোনো অধিকার থাকে না, যার পরিপ্রেক্ষিতে ওই উৎপাদিত দ্রব্যের দ্বারা যে লভ্যাংশ তৈরি হয় তা পুরোটাই ভোগ করে বা আত্মসাৎ করে মালিক শ্রেণি (যদিও এখানে মালিক শ্রেণীকে ঝুঁকি নিতে হয়)। ঠিক একই ভাবে যদি কলকারখানার মালিকের জায়গায় জোরদার বা জমির মালিককে বসানো হয়, কলকারখানার জায়গায় নির্দিষ্ট জমিকে বসানো হয়, শ্রমিক শ্রেণীর জায়গায় কৃষক শ্রেণীকে বসানো যায়, যে চুক্তির মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণী কলকারখানায় শ্রম প্রদান করতে চুক্তিবদ্ধ হচ্ছে তার জায়গায় যদি অপারেশন বর্গার আনুপাতিক ধারণাকে বসানো হয়, তাহলে স্পষ্ট ভাবে উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্বের ধারণাকেই অপারেশন বর্গা এর মধ্যে দেখা যায়(যদিও এখানে জমির মালিককে কোন রকম ঝুঁকি নিতে হয় না)। অর্থাৎ নির্দিষ্ট একটি সময় ধরে কৃষক শ্রেণী জমিতে ফসল ফলানোর জন্য জমি পরিচর্যা করে, সার, লাঙ্গল ও নিজের শ্রমকে নিয়োজিত করে ফসল ফলায়, আর সেই ফসলের ২৫% মালিক শ্রেণীকে প্রদান করতে হয়, যার ফলে কৃষক শ্রেণীর কাছে শ্রমিক শ্রেণীর মতই জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ছাড়া আর কোন কিছু অবশিষ্ট থাকে না। ফলে অপারেশন বর্গাকে নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়, 'অপারেশন বর্গা' সরাসরি কৃষক শ্রেণীর অর্থনৈতিক অবস্থানকে আমূল পরিবর্তন করতে পারেনি, ফলে কৃষক শ্রেণীর স্বার্থে বামফ্রন্টের নেওয়া 'অপারেশন বর্গা' সর্বজনীন গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে পারেনি। 'অপারেশন বর্গা' সার্বজনীন গ্রহণ যোগ্য হিসেবে গড়ে তুলতে হলে বামফ্রন্ট সরকারকে তার প্রায়োগিক দিকটিতে মার্কসীয় পথ অবলম্বন করতে হতো যা বামফ্রন্ট সরকার করেনি। মার্কসীয় পথ বলতে এখানে জমির ওপর ব্যক্তিগত সম্পত্তির অনুপস্থিতিকে বোঝানো হচ্ছে, অর্থাৎ ভূমিসংস্কার বা 'অপারেশন বর্গা'র আলোচনায় জমির মালিক ও বর্গাদারদের মধ্যে আনুপাতিক বিভাজন না ঘটিয়ে, যদি সমগ্র জমির উপর সমাজতান্ত্রিক মালিকানা প্রতিষ্ঠার উপর জোর দেয়া হতো তাহলে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার করার পথ অনেকটাই প্রশস্ত করা যেত পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে। মার্কস ১৮৭০ সালের পরবর্তী সময়ে যখন রাশিয়ার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তখন তার বিচার্য বিষয় হয়ে পড়ি রাশিয়ার কৃষি ব্যবস্থা, 'আমার গ্রন্থাগারে রুশ' নামক প্রবন্ধে তার প্রতিফলন দেখা যায়। রুশ গ্রামসমাজগুলোকে পর্যবেক্ষণ করে তিনি দেখতে পান যে রুশ গ্রাম সমাজে এমন কিছু গ্রাম সমাজ রয়েছে যেগুলোকে 'মীর' বলে

উল্লেখ করা হয়, সেখানে তিনি দেখতে পান যে গ্রাম সমাজগুলোর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল স্থানীয় অভিজাতদের সঙ্গে, যে অভিজাতরা নানা স্তরে জার শাসনতন্ত্রের অঙ্গ হয়ে গিয়েছিল এবং যাদের মাধ্যমে জার শাসন চলত গ্রামাঞ্চলে। গ্রামসমাজগুলো থেকে আদায় করা হত রাজস্ব, যুদ্ধ-বিগ্রহ বা স্থানীয় অভিজাতের নিজস্ব বিলাসিতার কারনে সে রাজস্বের হার মাঝে মাঝে বেড়ে যেত। গ্রামবাসীরা সমবেতভাবে এই দায় বহন করত, কেননা গ্রাম সমাজ বা 'মির'গুলোতে কোন ব্যক্তিগত অধিকার ছিল না জমির উপর- কোন গ্রামবাসী জমি কেনা বেচা করতে পারত না। রুশগ্রামসমাজে জমির উপর ব্যক্তিগত সম্পত্তির অনুপস্থিতি কার্ল মার্কসের গবেষণার বিষয় হয়ে উঠেছিল। 'মির'গুলো থেকে সরাসরি 'সমাজতান্ত্রিক মালিকানা' গড়া যায় কিনা গবেষণার কেন্দ্রে ছিল এই প্রশ্নটি। পরবর্তীকালে মার্কসের লেখাতে পাওয়া যায় যে, সমাজতান্ত্রিক সাম্যবাদী সমাজে উপনীত হওয়ার জন্য সব সময় যে 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ' এর নিয়ম মেনে প্রতিটি সমাজকে অতিক্রম করেই সেখানে উপনীত হতে হবে তার মানে নেই, কখনও কখনও সমাজতান্ত্রিক সমাজে উপনীত হবার জন্য কোন একটি সমাজের অনুপস্থিতি ও থাকতে পারে। সে দিক থেকে বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের কাছে জমির মালিকানা রাষ্ট্রকেন্দ্রিক করার মধ্যে সমাজতন্ত্রে উপনীত হওয়ার হাতছানি ছিল যা তারা অনুধাবন করতে পারেনি।

গবেষণাপত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে ১৯৯০ দশকের পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গের কৃষি নীতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, বিশ্বায়নের পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের কৃষিকে আরো বেশি বাণিজ্যিক কেন্দ্রিক করার জন্য, 'নয়া কৃষি অর্থনীতি' গ্রহণ করে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার, যেখানে নয়া কৃষি নীতি হিসেবে সিঙ্গুর নন্দীগ্রামের জমি অধিগ্রহণের কথা তুলে ধরা হয়েছে ,এবং তার পরিপেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গে ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট সরকারের পরিণতিও তুলে ধরা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মতো একটি রাজ্যে কৃষি, কৃষিজমি, কৃষক, কৃষিশ্রমিক ও সর্বস্তরের খেটে খাওয়া মানুষের উপর আক্রমণ চলবে, আর মানুষ সেটা মুখ বুজে মেনে নেবে সেটা হতে পারে না, বিশেষ করে সিঙ্গুরের ঘটনার পর পশ্চিম বাংলার গ্রাম অঞ্চল আবার উত্তাল হয়ে উঠেছিল, কৃষকের আন্দোলন, কৃষি শ্রমিকের আন্দোলন, খেটে খাওয়া মানুষের আন্দোলনের দাবি এক নতুন

ক্ষেত্রকে তুলে ধরেছিল। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার নতুন স্লোগান তুলে ধরেছিল 'কৃষি আমাদের ভিত্তি, শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ'। কিন্তু 'ভিত্তি'টাকে নষ্ট করে ভবিষ্যতের কথা ভাবে এটা দুনিয়ার কোথাও দেখা যায়নি, কোনো বুদ্ধিমান মানুষ এটা করে না, কিন্তু পশ্চিমবাংলায় আমরা সেটাই দেখেছি। যেটাকে বলা হচ্ছে 'ভিত্তি' সেই ভিত্তির উপর নামানো হলো আক্রমণ কৃষিজমি, কৃষক একের পর এক আক্রমণের শিকার হল। একদিকে কৃষক, কৃষিজমির উপর, কৃষি শ্রমিকের উপর আক্রমণ চলছে আর অন্যদিকে ভবিষ্যতের স্বপ্নের যে ফানুস টা দেখানো হয়েছিল তা হল সিঙ্গুরে টাটার কারখানা হবে, এক লাখ টাকার গাড়ি হবে, সেই টাটা এখান থেকে চলে গেছে গুজরাটে। ডানলপ কারখানা বন্ধ হয়ে আছে। যখন অনাহারে মৃত্যু, কৃষকের আত্মহত্যা, বর্গাদার ও পাট্টা তাদের জমি থেকে উৎখাত হওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি, কৃষি শ্রমিকদের সংখ্যা কোটি ছুই ছুই হওয়া এবং সর্বোপরি পশ্চিমবঙ্গের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির হার ভালো পরিমাণ কমতে লাগা, এই সমস্ত প্রবণতাকে আমলই দেয়া হলো না, 'উন্নয়ন'কে শ্রেণীসংগ্রাম হিসেবে সূত্রায়ন করে বহুজাতিক সংস্থা ও পুঁজিপতিদের জন্য লাল কার্পেট পেতে বহু 'মৌ' চুক্তি সম্পাদন করা হয়। কৃষকদের বলা হয় কৃষি জমি ছেড়ে দাও শিল্পপতিদের হাতে, বামপন্থী নীতিতে চলার কথা যারা বললেন তাদের 'পিছিয়ে পড়া মার্কসবাদী' লেভেল দিয়ে কেন্দ্রের উদারীকরণের পশ্চিমবঙ্গীয় রূপায়নের ঠিকাদারি নিয়ে বিশ্বায়নের নীতির সাথে খাপ খাওয়ানো তথাকথিত 'নব্য মার্কসবাদ ব্র্যান্ড'- বুদ্ধ মডেল ফেরি করা শুরু করেছিল। পশ্চিমবঙ্গের কৃষি সংকটের দিক বাড়ার সত্বেও বামফ্রন্ট সরকার কৃষি ভিত্তি মজবুত বলে উল্লেখ করেন। বহুজাতিক কোম্পানির স্বার্থে প্রণীত ম্যাকেনস রিপোর্ট এর উপর নির্ভর করার নীতি গ্রহণ করে, মেকনসি নীতি অনুযায়ী 'চুক্তি চাষের' ব্যবস্থা করে পেপসি, আইটিসি প্রভৃতি বহুজাতিকদের হাতে বাংলার কিসের ভাগ্যকে ছেড়ে দেওয়ার পথে পা বাড়িয়েছিল বামফ্রন্ট সরকার। রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন প্রতিবাদ ও আন্দোলনের পর কিছু সংশোধন করার পর যে কৃষিনীতি তৈরি হয়েছিলো, তাতে মূল বিষয় থেকে গেছে একই। কৃষি উৎপাদন ও বাজারে বহুজাতিক কোম্পানি ও বৃহৎ পুঁজিপতির অনুপ্রবেশ করানো, জমির উর্ধ্বসীমা তুলে দেওয়া প্রভৃতির পথ প্রশস্ত করা হয়। এই বামফ্রন্ট সরকারই ২০০৫ সালের কেন্দ্রের 'সেজ' আইন প্রণয়নের আগেই ২০০৩ সালে 'সেজ' এর মত একটি আইন প্রণয়ন করেছিল। তাতে জমি অধিগ্রহণের জন্য আইন গুলো তৈরি করে নিয়েছিল। 'শিল্পায়ন ও উন্নয়নের' জন্য কৃষি জমি অধিগ্রহণ এবং শিল্পের পরিকাঠামো

তৈরীর জন্য বড় বড় রাস্তা তৈরি, বড় বিমানবন্দর, দ্রুতগামিতার জন্য ফ্লাইওভার, হাউসিং, দামি দামি স্কুল, শপিং মল, বিভিন্ন ধরনের হাব, বেদিক ভিলেজের মত বিনোদনের জায়গা প্রভৃতি কত কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল, যা প্রকৃত অর্থে বিদেশি পুঁজি ও দেশীয় বৃহৎ পুঁজিপতিদের আকর্ষণের রাস্তা পরিষ্কার করা বলে মনে হয়। পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যে যেখানে ক্ষুদ্র কৃষক অর্থনীতির প্রাধান্য রয়েছে এবং কৃষি জমির উপর নির্ভরশীল ব্যাপক জনগণ সেখানে কি ধরনের শিল্প, কোথায় শিল্প হবে তার কোনো নীতি ও পরিকল্পনা নেওয়া হলো না। কৃষির গুরুত্ব ক্রমে ক্রমে কমিয়ে দিয়ে পুঁজিপতি ও ব্যবসায়ীদের স্বার্থে উন্নয়নমুখী বাংলা গড়তে চাওয়া হলো। উন্নত পুঁজিবাদী দেশে জাতীয় আয় ও শ্রম নিয়োগের ক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে। যেখানে জীবিকার মূল ক্ষেত্র শিল্প, আধুনিক পরিষেবামূলক কাজ ও ভোগ্য পণ্য ভিত্তিক সেবামূলক কাজ। সরকারের বা রাষ্ট্রের দায়িত্ব হল বৃহৎ পুঁজিপতিরা যাতে নির্বিঘ্নে উৎপাদনের কাজ করতে পারে তার পরিবেশ তৈরি করা। আমরা দেখেছি পশ্চিমবঙ্গের সরকার পথই নিয়েছিল।

কিছু বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ ও তাত্ত্বিকদের মতোই সিপিএমের নেতা, কৃষক নেতা ও শিল্পমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী প্রমূখ বর্তমান কৃষি সংকট এর অধীনে ক্ষুদ্র কৃষকদের ধ্বংসের দিকটি ঐতিহাসিক ভাবে স্বাভাবিক হিসেবে ধরে নেয়। কাজেই কৃষি জমি অধিগ্রহণ করে শিল্পায়নের মডেলকে 'উন্নয়ন' ও রাজ্যের অগ্রগতির দিক হিসেবে দেখান হয়। বিশ্বায়ন ও উদারীকরণ নীতির ফলে বহুজাতিক সংস্থা বা কর্পোরেট হাউসগুলো চাই- অত্যন্ত সুলভে বিশালায়তন কৃষিজমি ও তার মালিকানা। তার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমি জোতগুলো ভেঙে দেওয়া এবং জমির সিলিং প্রথা উঠিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে লেনিন বৃহৎ সামন্ত অর্থনীতির বিরুদ্ধে ক্ষুদ্রায়তন চাষের পক্ষে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি দেখিয়েছেন, ক্ষুদ্র মালিকানাকে সমর্থন করা মার্কসবাদী ও বামপন্থীদের কর্তব্য হওয়া উচিত। যেখানে পেটিবুর্জোয়া অর্থনীতি বৃহদায়তন সামন্ত অর্থনৈতিক তুলনায় প্রগতিশীল সেক্ষেত্রে সমর্থন করা তাদের কর্তব্য হওয়া উচিত। এমনকি লেনিন রাশিয়াতে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পর ক্ষুদে কৃষকদের না করে বড় বড় জোতদার-জমিদারদের উৎখাত করার নীতি গ্রহণ করেন। ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে সমবায়ের উদ্যোগ ও সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করা যেতে পারে। বর্তমান কৃষি সংকট কৃষক শ্রেণীর মধ্যে শ্রেণি বিভাজন ও ছোট

কৃষকদের জমি বেদখল হয়ে যাওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি ঘটালেও সিপিএম পুঁজিপতি-জোতদার- ধনী কৃষকদের স্বার্থ রক্ষাকারী কৃষি নীতিকেই সমর্থন করেছে। তার জন্যই তারা বর্গাদারদের জমির মালিকানা স্বত্ব দিতে রাজি নয়, তেমনি জমির ঊর্ধ্বসীমা তুলে দেওয়ার অপচেষ্টা শুরু করে। পাশাপাশি নতুন সিলিং বহির্ভূত জমি অধিগ্রহণ করা থেকেও নিজেদের সরিয়ে নেয়। আর এইগুলো বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতে সিপিএমের দক্ষিণপন্থী দৃষ্টিভঙ্গিকে নির্দিষ্টভাবে উন্মোচিত করে দিয়েছিল।

এই গবেষণায় একটি মৌলিক ধারণা সীমাবদ্ধতার মধ্যে বিকশিত হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে ধ্রুপদী মার্কসবাদীদের মতে কৃষক সম্প্রদায়ের ধারণা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে যদিও তাদের আলোচনা দেখলে শক্তিশালী গণতন্ত্রের যে কাঠামো তার ওপর কোনো ধারণা পাওয়া যায় না। তারা মনে করত যে পুঁজিবাদী সমাজের জন্যই ক্ষুদ্র এবং মাঝারি মাপের কৃষক সম্প্রদায় একটা সময়ে ভূমিহীন কৃষকে পরিণত হবে এবং তারা পরবর্তীকালে বিপ্লবে অংশগ্রহণ করবে। মার্কস এঙ্গেলস পরবর্তী মার্কসবাদী তাত্ত্বিক বুখারীন, মাও ও লেলিন, সেই অর্থে কোন সক্রিয় তত্ত্ব প্রদান করতে পারিনি যা ছিল তাদের গুরুতর ভাবে অবাস্তব ও রাজনৈতিক চিন্তা ভাবনার সীমাবদ্ধতা। মার্কস পরবর্তী অনেকেই মার্কসবাদী আলোচনা করেছেন কিন্তু কি কৌশলে এবং কি পরিকল্পনায় তা পরিচালিত হবে সে নিয়ে তর্ক বিতর্ক হলেও কোনো সুনির্দিষ্ট রূপরেখা পাওয়া যায়নি। অনেক তাত্ত্বিক দাবি করেছেন যে কিছু বিপ্লবী, সামন্তপ্রভুতে পরিণত হতে চেয়েছে স হিংসা বিপ্লবের মাধ্যমে। যারা না সংসদীয় ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত, না সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের নির্বাচনে রাজনীতির সাথে জড়িত, না কেন্দ্রীয় ও কোন ধরনের সমাজতান্ত্রিক দল গুলোর সাথে জড়িত। সেখানে এক প্রেক্ষাপটকে অন্য প্রেক্ষাপট প্রত্যক্ষ করা যাবে না। মার্কসবাদী চিন্তা গুণগতভাবে ভারত থেকে ভিন্ন এই সত্যটা দৃষ্টিগোচর করা প্রয়োজন। এই গবেষণায় বিশ্লেষিত হয়েছে একটি প্রদেশে বাম জোটের মাধ্যমে সংসদীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণের মধ্যে কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যেখানে ভারতের ইতিহাসে মূলধারায় বাম আন্দোলনের সঙ্গে মতাদর্শগত পার্থক্য লক্ষ্য করা গেছে সংসদীয় যোগ্যতা, সংস্কারবাদী কাজকর্ম বা বিপ্লবী সহিংসতার মধ্য দিয়ে। সামগ্রিকভাবে বাম বাহিনীর দুর্বলতা ছিল এই যে এটি কখনোই রাশিয়া চীনের মতো

বিপ্লব সংগঠিত করতে পারে নি। কেননা ভারতে বিপ্লব ছিল বিক্ষিপ্ত বা অপেক্ষাকৃত অসম্পূর্ণ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি দল গুলিও বর্ণ, উপজাতি ইত্যাদির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। এই গবেষণার মধ্যে অতি বামপন্থী দৃষ্টিকোণ দেখানো কোন উদ্দেশ্য নেই, কারণ তারা কখনোই পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতা দখলের কাছাকাছি আসতে পারেনি পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার ও কৃষকদের ঘিরে নানা বিতর্ক জটিলতা সৃষ্টি হলেও এটি একটি স্বাতন্ত্র্যসূচক চরিত্র এবং তা কখনোই রাশিয়া ও চীনের বিপ্লবের সঙ্গে এক কক্ষে রাখা ঠিক নয় চিন বা রাশিয়ার মত বিপ্লবের মাত্র যেমন উগ্র ছিল না, ঠিক তেমনি মার্কসীয় কৃষি চিন্তা ধারণা কেও প্রয়োগ করার কোনো প্রচেষ্টা ছিল না।

দ্বিতীয়তঃ চূড়ান্ত অধ্যায় দেখানো হয়েছে ২১ শতকে কৃষক বিষয়ক উন্নত হয়েছে এবং তাদের রাজনীতিকে এই পরিবর্তন প্রভাবিত করেছে। মার্কসবাদের উদ্বেগের কারণ ছিল জমির উৎপাদন ও কৃষি শিল্প। ভারতবর্ষের বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন পার্থক্য একটি প্রসঙ্গকে খুঁজে বের করে। পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যে জমির মালিকানা সম্পর্কিত প্রশ্ন, যেখানে বড় বড় জমি আছে, যেমন- পাঞ্জাব, বিহার, অন্ধ্রপ্রদেশ বা তামিলনাড়ুর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এবং ছোট জমির মালিকানার মধ্যে এক ধরনের অমিল দেখা যায়। গণতন্ত্র আসার আগে একটি সম্পূর্ণ শিল্পের রূপান্তর সমাজের অর্থ ছিল ভূমি অধিগ্রহণের নীতিগত প্রতিরোধ ও নাগরিক সমাজের বিরোধিতা করা। উপরোক্ত শিল্পায়নের প্রতি চলা পশ্চিমবঙ্গের সব সময় একটি জটিল বিষয়। যেখানে বড় শিল্পের অভাব রয়েছে ও অবশিল্পায়ন ঘটেছিল ১৯৬০ সালের পর থেকে। এল এফ র শিল্পায়ন তাদের ও তাদের বংশধরদের উপকার করেছিল। বড় শিল্পের অভাবে রাজ্য ও তার কাজকর্ম সব সময় জটিল পরিস্থিতির মধ্যে ছিল। নন্দীগ্রাম এবং সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের ক্ষুদ্র ও মধ্য কৃষকদের কন্টেক্সটুয়ালাইজ করা একটি সাধারন পরিস্থিতিতে একটি বড় রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ ছিল। যারা জাতীয় বৈশ্বিক উভয় দেশেই জমি অধিগ্রহণের সম্ভাব্য জালিয়াতি নিশ্চিত করতে পারে না, এমন কৃষকদের একসঙ্গে আসা রাজনৈতিক চরিত্র এল এফ থেকে কৃষকদের বিচ্ছিন্ন করল। ফলে তারা বামেদের শিল্পবান্ধব নীতিতে অনিরাপদ এবং অনাথ অনুভব করল। বলাবাহুল্য এই গবেষণা শাস্ত্রীয় মার্কসবাদের একটি সময়ের তত্ত্ব বা অনুশীলনের থেকে ভিন্ন এবং এই গবেষণা কোন শ্রেণীর

সমস্যার সরাসরি চেতনা রেফারেন্স দাবি করে না। এই গবেষণা শুধুমাত্র বামপন্থী কৃষিনীতি দলিল এবং যা দেখায় কিভাবে তিন দশক ধরে বামপন্থী চিন্তাধারার পরিবর্তন ও প্রভাবিত করেছে.

*****

সহায়ক পাঠ

গ্রন্থপঞ্জি -

1. Hussain, Athar : Marxism and the Agrarian Question Keith Tribe

2. Lenin , V. I. The Agrarian Question and the Present Situation in Russia, Za Pravdu No. 36, November 15, 1913. Signed: V. Ilyin. Published according to the Za Pravdu text. Lenin Collected Works, Progress Publishers, 1977, Moscow, Volume 19, pages 487-491

3. Lenin, V. I. : THE AGRARIAN QUESTION AND TH "CRITICS OF MARX"

4. Kingston-Mann, Esther : Lenin and the Beginnings of Marxist Peasant Revolution: The Burden of Political Opportunity, July-October 1917.

5. Neil Harding. Lenin's Political Thought. Volume 1, Theory and Practice in the Democratic Revolution. New York: St. Martin's Press. 1978. Pp. 360. $25.00.

6. Engels, Frederick: The Peasant Question in France and Germany, in Die Neue Zeit, 1894-95;

7. Shanin, Teodor: Late Marx and the Russian Road: Marx and the Peripheries of Capitalism", Routledge, GB. Monthly Review US, 1983;

8. Shanin, Teodor. (1972). The Awkward Class: Political Sociology of Peasantry in a Developing Society, Russia 1910-1925. Oxford: The Clarendon Press.

9 Shanin, Teodor.. 'Peasants and Peasant Societies' (ed.) Penguin Books, 1971;

10. Guha, Ranajit : A Rule of Property for Bengal: An Essay on the Idea of Permanent Settlement, Paperback – Import, 10 Apr 1996

11. Sharma, Ram Sharan Sharma **:** Indian Feudalism, C. AD 300-1200,

12. Mukhia, Harbans : The Feudalism Debate ISBN 978-81-7304-284-3

13. Mukhia, Harbans : Feudalism and Non-European Societies (Special issue of the Journal of Peasant Studies, 12)

14. Mukhia, Harbans: Exploring India's Medieval Centuries: Essays in History, Society, Culture and Technology ISBN 978-93-5002-047-0

15. Mallic, Ross: Development, Ethnicity and Human Rights in South Asis

16. Bhattacharyya, Dwaipayan : Government as Practice: Democratic Left in a Transforming India (South Asia in the Social Sciences) | 8 January 2016

17. Banerjee, Sumanta : Marxism and the Indian Left: From 'Interpreting' India to 'Changing' itHardcover – 2012

18. Dipankar Basu : Political Economy of 'Middlerness', Behind Violence in Rural West Bengal. EPW, April 21, 2001.

19. Ranjan Roy : Poverty, Household Size and Child Welfare in India, EPW, September, 23, 2000.

20. Sunil Sengupta and Haris Garden (1997) Agrarian Politics and Rural Development in West Bengal in Dreze and Sen (eds.).

21. Raghab Bandhyopadhyay : Agrarian Backdrop of Bengal Violence, EPW, February, 3-10, 2001.

22. Simonds, H.C. Evana and W.M. Blency : Pesticide for the year 2000, Mycochemical and Botanical in Pest Management and the Environment in 2000, published by CAB International 1992.

23. Jenet Bell : Genetic Engineering and Biotechnology in Industry, Biodiversity, People and Profit. International Technology Publication, 1996.

24. National Family Health Survey, 1998-99.

25. Mallick, West Bengal Land Reforms Act-1955,

25. Molloy Chaopadhyay, Waged Labour Arrangements in a West Bengal Village, Economic and Political Weekly, February 17,2001.

26. Dr. R.H. Richharia & Dr. S. Govindaswami, Rices of India : Academy of Development Science (1990).

27. P.K. Bera : Change in the first Scenario After HYV introduction in West Bengal : Proceeding of the workshop on the conservation and community copy rights of Folk Crop Variety, W.W.F. India Eastern Region.

28. Dr Claude Alvares : The Great Gene Robbery : The Illustrated Weekly of India, 23-29 March, 1986.

29. Damiel Querol : Genetic Resource : Our Forgoen Trees : Third World Network.

30. 'Some Experiences in Our Party's History'-selected works of Mao Tse Ttung, vol 5, pg 327 Foreign Languages Press, Peking,1977

31. "Chinese Revolution And Chinese Communist Party"-Selected works of Mao Tse Tung, vol-2, pg-320, Foreign Languages Press, Peking,1965

32. "The Indian Big Bourgeoisie- It's genesis, growth and character"-Suniti kumar Ghosh, New Horizon Book trust, jan 2000

33. Irfan Habib, "Colonization of Indian Economy, 1757-1900", Social Scientist, March, 1975

34. "The Indian Big Bourgeoisie- It's genesis, growth and character"- Suniti kumar Ghosh,

35. Aditya Mukherjee, "Imperialism, Nationalism, and the Making of Indian Capitalist Class,1920-1947"

36. F. Engels- "Peasant War In Germany", preface to the 2nd edition, 1874

37. SATHYAMURTHY, T.V : industry and agriculture in india since independence ;VOL-2 (land reform in west Bengal.

38. Narang, A.S: Indian Government and politics.

39. Malhotra, Avtar singh : Communism Today(4): what is the Communist Party.

40. CPI(M) : Report on Organisation by the plenum of the central Committee.

41. CPI(M) : C.C and P.B Resolutions and Statements(1969 to 1971)

42. মৈত্রীশ ঘটক পশ্চিমবঙ্গ ভূমি ব্যবস্থার সংস্কার এবং কৃষি উৎপাদনশীলতা অনিক অক্টোবর নভেম্বর ২০০১

43. অজিত নারায়ণ বসু পশ্চিম বাংলার কৃষি যা হয়ে চলেছে এবং যা হওয়া সম্ভব অক্টোবর নভেম্বর ২০০১

44. অনিন্দ্য সেন পশ্চিম বাংলার গ্রাম অঞ্চলে ভূমিকম্প ও রাজনৈতিক বিন্যাস একটি আন্তঃসম্পর্ক রচনা চেষ্টা অন্যস্বর এপ্রিল ২০০১

45. শুভ্র কেতন বসু, সাম্রাজ্যবাদ, অনিক

46. কার্ল মার্কস 'পুঁজি'

47. রামদাস working-class এন্ড বুর্জোয়া পর্লামেন্টারি দেমোক্রেসি এক্সিস্ট এপ্রিল-জুন ১৯৮৪

48. প্রভাত দত্ত 'ল্যান্ড রিফর্ম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল', পাবলিশিং হাউস, নিউ দিল্লি, ১৯৮৮।

পত্রিকা সমূহ -

1. Aviodable Tragedy of left in India : EPW, 19/10/91, 2408
2. Sumen Salis : Farmers' Right and Food Security : EPW, March 11-17, 2000.
3. Land Reform experience : perspective for strategy and programmers': EPW, 27/06/91
4. the left and democracy : EPW, 16/11/91
5. Panchayat and left politics in West Bengal : EPW, 29/05/93
6. Ajit Ray : West Bengal shift in political alignment, 2-9/01/93
7. Dialectics : West Bengal's communist leaders adjust to change, FEER: 14/04/94
8. For a new debate on West Bengal : EPW : 16/07/94
9. Mao and the Indian Communist movement : China report, 01/03/95
10. West Bengal : grass root realistic confront left from : 21/03/98
11. CPIM in West Bengal : was of the parliamentary left : EPW, 10/06/2000
12. Logic of failed revolution : federalization of CPIM : EPW, 29/01/2000
13. Sumanta Banerjee : West Bengal : violence without ideology : FEER, 19/08/2000
14. Left front win in West Bengal : continuity but also change : 02/06/01
15. Sumanta Banerjee: the left after the election : FEER, 02/06/2001

16. Indian national front and United front Coalition government : a phase in Federal governance : EPW, 3-4/2004
17. West Bengal : parlous state of government Finance : EPW, 30/12/2000
18. India in the 1990's : the impact of globalization : epw, 1/3/2003
19. Land Reform and Agriculture for the West Bengal experience : EPW, 01/03/2003
20. Reform agenda for agriculture : EPW, 15/02/2003

ওয়েবসাইট লিঙ্ক -

1. http://desh.co.in/web/guest/storydetail/-/deshstory/%E0%A6%95%E0%A7%83%E0%A6%B7%E0%A6%BF,%20%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA,%20%E0%A6%AD%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%8E-102534

2. https://www.google.co.in/amp/s/chintanmarxist.wordpress.com/2002/07/02/%25E0%25A6%25AA%25E0%25A6%25B6%25E0%25A7%258D%25E0%25A6%259A%25E0%25A6%25BF%25E0%25A6%25AE%25E0%25A6%25AC%25E0%25A6%2599%25E0%25A7%258D%25E0%25A6%2597%25E0%25A7%2587%25E0%25A6%25B0-%25E0%25A6%2595%25E0%25A7%2583%25E0%25A6%25B7%25E0%25A6%25BF-%25E0%25A6%2596%25E0%25A6%25B0%25E0%25A7%258D%25E0%25A6%25AC/amp/

3. http://chintaa.com/index.php/chinta/showAerticle/416/%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A6-%E0%A6%AE%E0%A6%9C%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0/%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B6-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A6%B6-%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0/bangla

4. https://waytoanamitra.wordpress.com/%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%AE-%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%AB%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F-%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%B8/

5. https://meghduthnews24.com/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%B8-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A4/

6. https://www.cpim.org/content/thirty-years-left-front-government-west-bengal

7. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.alterinter.org/%3FThe-crisis-of-Communism-in-West-Bengal&ved=2ahUKEwik0b_WjsHhAhXk6nMBHdgkA0o4FBAWMAV6BAgAEAE&usg=AOvVaw0jGb08IiRKAv60jDHDTjUq

8. https://www.cppr.in/governance-law

9. https://cpim.org/marxist/200702_marxist_s.misra-agri-wb.pdf

10. https://www.jstor.org/stable/40278340

*****